১ম বর্ষ।] বৈশাখ ১৩২০। [১ম সংখ্যা।

"প্রাণো বা অমৃতম্" শ্রুতিঃ

স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক
মাসিক পত্র।

কবিরাজ
শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ সম্পাদিত

প্রকাশক—শ্রীকামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল।
"আর্য্য ভৈষজ্য নিকেতন" ঢাকা।

সূচী।

।] আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ কার্য্যালয়, পাটুয়াটুলী, ঢাকা। | প্রতি সংখ্যা।০

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র।)

"আয়ুঃ কামযমানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পবমাদরঃ॥"

বাগ্‌ভট।

প্রথম বর্ষ। | বৈশাখ, ১৩২০ সাল। | ১ম সংখ্যা।

প্রকাশকের নিবেদন।

অনন্ত জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ একটী সার সত্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা এই :—"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাম্ আরোগ্যং মূলমুত্তমম্"। স্বাস্থ্যই চতুর্ব্বর্গ সাধনের মূল কাবণ। সুতবাং পৃথিবীতে মনুষ্যের যত প্রকার কর্ত্তব্য আছে, তাহাব মধ্যে সুস্থদেহে সুস্থমন রক্ষা করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বাস্থ্যই সমস্ত সুখেব মূল, স্বাস্থ্যই জীবনেব শ্রেষ্ঠধন (Health is Wealth)।

কি উপায়ে এই স্বাস্থ্য বক্ষা কবিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়; কি প্রণালী বা নিয়ম অবলম্বন করিলে, রোগমুক্ত থাকিয়া মানবজীবনের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সুষ্ঠু সম্পাদিত করা যাইতে পাবে ইত্যাদি বিষব আলোচনা করা এবং সহজ সরল ভাষায় আ-পামর সাধাবণ্যে তাহা প্রচার করা বর্ত্তমান পত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আজ কাল নানা প্রকার ডাক্তারী চিকিৎসাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে ও প্রতিদিন অভিনব ঔষধ প্রচারিত হইতেছে। আমরা বিদেশাগত সেই সকল সুরামিশ্রিত উগ্রবীর্য্য ঔষধ সেবন করিয়া দিন দিন অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছি এবং স্বাস্থ্যের নামে অস্বাস্থ্যের বীজ বপন করিতেছি। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ার ঔষধ স্কটলণ্ডবাসীর পক্ষেও সর্ব্বথা উপযোগী নহে। এজন্যই "যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জং তস্যৌষধং হিতম্"—যে দেশের যে জন্তু, তাহার পক্ষে সেই দেশজাত ঔষধই হিতকর। এই মহাবাক্য কথিত হইয়াছে।

প্রখ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন মহাশয় তদীয় প্রতিসংস্কৃত অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"বস্তুতঃ ভারতীয় সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিগণ ভূয়োদর্শন বা যোগানুসন্ধানে আমাদের দেশ কাল, প্রকৃতিসমূহ পরীক্ষা পূর্ব্বক যে সমুদায় ঔষধের ব্যবস্থা উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্ত যে আমাদের পক্ষে একান্ত অনুকূল ও এপ্রদেশের একমাত্র মঙ্গলের নিদান, এক্ষণে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের আবিষ্কৃত ঔষধ সমূহ আমাদের পক্ষে এত সুলভ যে, কত শত আশুফলপ্রদ ঔষধ, গৃহস্থের বাটীর যথায় তথায় পাওয়া যায়, গৃহস্থ প্রতিপদবিক্ষেপে তাহা দলিত করিতেছেন। গৃহস্থ ঐ সকল পরিজ্ঞাত থাকিলে, ব্যবহার করিয়া কত উৎকট রোগ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারেন"। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার বিশ্ব-বিদিত "History of Hindu Chemistry" নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগের অনুক্রমণিকায় ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের মৌলিকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং ইহাও দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ সভ্য জগতের যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের আদিকারণ ও শীর্ষস্থানীয়।

প্রাচীন ভারতে ঔষধ চিকিৎসা চরক প্রভৃতি মহর্ষির এবং অস্ত্রচিকিৎসা সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষির গ্রন্থে যেমন theoretical উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনে কার্য্যতঃও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কালবশে প্রাচীন অস্ত্রচিকিৎসা, শবব্যবচ্ছেদপ্রণালী, শল্যোদ্ধারণ প্রভৃতি দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঔষধচিকিৎসার (medicine) তেমন দুর্দ্দশা হয় নাই এবং আজ কাল তাহার ভূয়সী আলোচনায় প্রভূত কল্যাণের সূত্রপাত হইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদের সনাতন ও অমূল্য সত্যগুলির সরল ভাষায় আলোচনা করা, প্রাচীন বৈদ্যক রত্নরাজি "খনির তিমির গর্ভ" হইতে লোক-লোচনের সম্মুখে উপস্থিত করা, স্বাস্থ্যতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাচীন অথচ সহজ সরল উপায়গুলি বলিয়া দেওয়া, ঋষিকথিত সুপরীক্ষিত দিনচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা, ঋতুচর্য্যার নিয়মগুলিও সরলভাষায় ব্যক্ত করা, আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকার উদ্দেশ্য।

কেবল তাহাই নহে, ইহাতে বিদেশীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব, দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের স্বাস্থ্য ও ভৈষজ্য বিষয়ক বিবিধ আবিষ্কার কাহিনী, আধুনিক ও প্রাচীন স্বাস্থ্যনীতি, দেশকাল পাত্রভেদে আয়ুর্ব্বেদীয় উপায়গুলিও ইহাতে যথাসম্ভব সন্নিবেশিত থাকিবে।

আমরা জানি, আজ কাল বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর পত্রিকার অল্প বিস্তর প্রচার আরম্ভ হইয়াছে এবং দুই একখানি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, পরমায়ুবিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব, যতই আলোচিত হয় ততই দেশের ও সমাজের কল্যাণ। আমরা এই মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ে বর্ত্তমান রাখিয়া অল্পধী হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র, ক্রুটী অনেক; কিন্তু সমাজের কল্যাণকামনা ও হৃদয়ের একাগ্রতাই আমাদের অবলম্বন, আর শেষ অবলম্বন সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার আশীর্ব্বাদ;—

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্॥"

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা যেরূপ বৃহৎ কল্যাণকর কার্য্যে ব্রতী হইতেছি, তাহা সমবেত চেষ্টাসাপেক্ষ। তাই দেশভক্ত মহোদয়গণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন নিজ নিজ শক্তি দ্বারা আমাদের সহায়তা ও পৃষ্ঠ-পোষণ করেন।

অনুক্রমণিকা।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রাণীমাত্রই প্রধানতঃ নিজের এবং নিজ সমাজের প্রাণরক্ষায় নিরত। তন্মধ্যে যাঁহারা সমধিক উচ্চশ্রেণীর জীব, তাঁহারা নিজের ও সমাজের প্রাণরক্ষার চিন্তা করিয়াও নিখিল বিশ্বের প্রাণীবর্গের চিন্তায় নিবিষ্ট হন। জীবের মধ্যে মানবজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মানবের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীর মনুষ্য বিদ্যমান। উত্তম শ্রেণীর মানব সর্ব্বদাই জগতের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত আপন আপন শক্তির নিয়োগ করিয়া থাকেন। মানবের অশেষ কল্যাণকর যাহা কিছু বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে, এই শ্রেণীর মানবগণের সাধনা কল্পবল্লীর ফলই তৎসমুদায় বলিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদও সেই সর্ব্ব-লোকহিতৈষী আর্য্য ঋষিগণের অশেষজনমঙ্গল্যকর অমৃতময় ফল।

সকল প্রাণীই নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী প্রাণরক্ষার উপায় করিয়া থাকে। এই প্রাণ চেষ্টার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আছে। মানবের প্রাণ চেষ্টাবিধিই সর্ব্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইতর প্রাণীমাত্রই নৈসর্গিক উপায়ে প্রাণরক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু মানব নৈসর্গিক বিধান অবলম্বন করিয়াও অপর এমন কিছু করে, যাহা পরম রহস্যময়। এ রহস্য বড় অদ্ভুত ও অনন্তপারগামী।

প্রাণরক্ষার অবসরেই প্রাণীগণ একটু সুখান্বেষণে লালায়িত হইয়া উঠে, সেই সুখলিপ্সাটুকুও কম রহস্যজনক নহে। প্রাণের জন্য যে প্রচেষ্টা, সুখের জন্য যে টুকু সূক্ষ্মানুসন্ধান, তাহা মূলতঃ এক হইলেও ইতর জীবে ও মানবজীবে যেমন একটা পার্থক্য, সেইরূপ মানবশ্রেণীর মধ্যেও একটা ঘোর পার্থক্য আছে।

মানবের এই প্রাণ চেষ্টা ও সুখানুসন্ধানবৃত্তি যে পরিমাণে উন্নত হইয়াছে অর্থাৎ মানবগণ যত অধিক প্রাণরক্ষা এবং যতটা সুখ স্থায়ী করিতে পারিয়াছে বা পারিবে, তাহারাই তত উন্নত বলিয়া পরিগণিত। এই উভয়টীর উৎকর্ষের নিমিত্ত পৃথিবীর মহাপুরুষগণ বহু আলোচনা অনুসন্ধান করতঃ যাহা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, লোকহিতের নিমিত্ত সে সমুদয় প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে নানাদেশে প্রাণরক্ষাও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিত্য নূতন বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। আরও কত আবিষ্কৃত হইবে তাহারও সংখ্যা করা যায় না। এজন্য প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে সামান্য চেষ্টা হয় নাই।

প্রাণ ও সুখবর্দ্ধনের যত প্রকার উপায় গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী কত উপযোগী, ইহাই এক্ষণে সকলের প্রধান আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র সভ্যসমাজ এজন্য নিজ নিজ প্রাণ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিতে বিশেষরূপে কৃতপ্রযত্ন হইয়াছেন। নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির কোন্‌টী যে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত তাহা প্রমাণ হয় নাই, হওয়াও বড় সহজ নহে।

প্রাণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচ্য ভূমিরও কতকগুলি আদর্শ রহিয়াছে। যাহার সাহায্যে এক সময় এদেশও প্রাণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিল বলিয়া শুনা যায়। তাহার ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। এদেশবাসীর প্রাণ, সুখ বা স্বাস্থ্য যখন দিন দিনই ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছে তখন আমাদেরও তাহার কারণ নির্ণয় ও তৎপ্রতিকারপরায়ণ হওয়া প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশের লোকেরই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় যেদেশ প্রাণ যাত্রার পথ প্রদর্শক, সে দেশের স্বাস্থ্য ও আয়ু ক্রমেই হ্রাস হইতেছে।

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ সম্বন্ধে আমাদের সম্মুখে প্রাচীন আদর্শ এক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র। আর আধুনিক পাশ্চাত্য দেশীয় ও বহু বহু আদর্শ নিত্য নিত্য নবীন ভাবে আমাদিগকে বিমোহিত করিয়া তুলিতেছে।

উদ্দেশ্য যখন সকলের এক, তখন পরস্পরের আদর্শই পরস্পর উন্নতির উপায়স্বরূপ হইবে আমরা মনে করি। পাশ্চাত্যগণ যেরূপ তাঁহাদের বিজ্ঞান নিচয় নানাভাবে প্রকাশ করিয়া সমগ্র জগৎবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। সেরূপ এতদ্দেশীয় বিজ্ঞান তত্ত্বগুলিও সর্ব্বসাধারণে বহুল ভাবে প্রচার হওয়ার আবশ্যকতা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে সুখের মূলই স্বাস্থ্য বা নীরোগিতা, দেখা যায় বহু চেষ্টা করিয়াও একবারে নীরোগ দেহে জীবন যাপন হয় না, আবার ইহাও সত্য যে, চেষ্টার অভাবে অকালে বহু জীবন ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। ইহাতে বেশ প্রতীয়মান হয়, চেষ্টার একটা শুভ ফল পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুস্থ দেহে রোগ না আসিতে পারে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে দুঃসাধ্য রোগদ্বারা আক্রান্ত হইলেও তাহার প্রতিকার হইতে পারে এবং স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার বহু তথ্যপূর্ণ বিজ্ঞানসমূহ নিবদ্ধ আছে। এ সমুদয় তত্ত্ব সাধারণে, যত অধিক প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল।

শারীর বিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে যে অনেক রোগের হাত হইতে সহজে রক্ষা পাওয়া যায় তাহা স্বতঃসিদ্ধ। অগ্নি, জল, বাত্যা, বজ্রপাত, বিষজপ্রাণী সর্পাদির দংশন প্রভৃতি, দৈবদুর্বিপাক ঘটনা দ্বারা সহসা আক্রান্ত হইলে, অথবা সংক্রামক ব্যাধিতে যখন দেশ প্রায় উচ্ছন্ন হইয়া উঠে, সে সময় যে কি কর্ত্তব্য অনেকেই তাহা অবগত নহেন। আয়ুর্ব্বেদে এ বিষয়েও বহু উপদেশ রহিয়াছে। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদে বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে সাধারণের জ্ঞান থাকিলে দৈবাৎ সংক্রামক ব্যাধিদ্বারা দেশ আক্রান্ত হইলেও সহজে তাহা নিবারণ হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ দেহ রক্ষার জন্য সকলকেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শুধু চিকিৎসকগণই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবে, এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত।

আয়ুর্ব্বেদ এক অপারজলধি বিশেষ হইলেও তাহাতে এমন কতকগুলি সহজ সরল উপদেশ আছে, যাহা সকলেই সামান্য চেষ্টায় পালন করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে। ইহাতে মানবের সুখবর্দ্ধনের সমস্ত পন্থা গুলিই নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদকে শাস্ত্রকারগণ আটভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথম রসায়নতন্ত্র—ইহাতে অকালবার্দ্ধক্য না আসিতে পারে তাহার উপায়, দীর্ঘায়ু, মেধা, বল জনন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগসমূহের উপশমবিধি সকল বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বাজীকরণতন্ত্র—এই শাস্ত্রে ক্ষীণশুক্রের বর্দ্ধন, দূষিত শুক্রের সংশোধন, শুষ্ক শুক্রের সাম্যস্থাপন, শরীরের কান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি সম্পাদক বিশেষতঃ পুংশক্তির সমধিক উৎকর্ষসাধক উপায় সকল নির্দ্দিষ্ট আছে।

তৃতীয় কায়-চিকিৎসা—ইহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত রোগ সকল যেমন জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোষ বা যক্ষ্মা, উন্মাদ, অপস্মার (মৃগী) কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতির উপশম হইয়া থাকে।

চতুর্থ শল্যতন্ত্র—বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধূলি, লৌহ, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ প্রভৃতি শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, সে সমুদয় বাহির করিবার নিমিত্ত, ব্রণাদির পূযাদি নির্গত করিবার জন্য এবং গর্ভশল্য (গর্ভে সন্তান আটকাইয়া যাওয়া) উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা এই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আর ইহাতে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নিপ্রয়োগ ও

বিবিধ ব্রণসমূহের বিবরণ কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া কিরূপে শারীরতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, সে সমুদয়ও বিশদভাবে উল্লিখিত আছে।

পঞ্চম শালাক্যতন্ত্র—এই শাস্ত্রে জত্রুর (কণ্ঠবক্ষের সন্ধি) উপরিস্থ অঙ্গসমূহের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ প্রভৃতির রোগসমূহের ভেষজ ও অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার বিষয় কথিত হইয়াছে। অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা চক্ষুরোগ আরোগ্য করিবার অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক বিধান এই শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর চিকিৎসা এখন একরূপ লোপ পাইয়া উঠিয়াছে।

ষষ্ঠ কৌমার ভৃত্য—এই শাস্ত্রে শিশুপালন, ধাত্রীদুগ্ধের শোধন এবং দূষিত স্তন্য ও গ্রহ-দোষজনিত রোগসমূহের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। ধাত্রীকে ঔষধ সেবন করাইয়া যে শিশুরোগ চিকিৎসা করা যায়, তাহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া কৌশল এই শাস্ত্র আলোচনা করিলেই জানা যায়।

সপ্তম অগদতন্ত্র—এই শাস্ত্রে সর্প, কীট, লূতা, বৃশ্চিক ও মূষিকাদির দংশন জনিত বিষের বিবরণ এবং বিবিধ প্রকার বিষ ও সংযোগজ বিষের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রের আলোচনা না থাকায় প্রতি বৎসর কত শত শত লোক সর্পাদির দংশন জনিত বিষে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই।

অষ্টম ভূতবিদ্যা—দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস পিতৃগণ, পিশাচগণ, নাগ প্রভৃতি গ্রহদিগের আবেশ জন্য যাহাদের মন বিকৃত হইয়া থাকে, এই শাস্ত্রে তাহার প্রশমনের নিমিত্ত বিবিধ শান্তিকর্ম্ম ও পূজা প্রভৃতির উপদেশ আছে।

যদিও শাস্ত্রকার এই সাধারণ আটটী পৃথক্ সংজ্ঞা দিয়া থাকুন, কিন্তু ইহার মধ্যেই বহু শ্রেণীভেদ হইতে পারে। মানুষের সুখপূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের যাবতীয় উপায়ই ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে বিক্ষিপ্তভাবে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, আপনারা ইহাতে দেখিবেন,—পৃথিবীর জলবায়ু, ভূমি ও তাপের অবস্থা, গ্রহাদির গতির শুভাশুভ, জন্মমৃত্যুরহস্যের গূঢ়তত্ত্ব, ধর্ম্মাধর্ম্মের পর্য্যালোচনা, ইহকাল, পরকালের যুক্তিপূর্ণ উপাদেয় তত্ত্ব সকল, সুস্থ শরীরে রোগ না আসার উপায়, রোগোৎপত্তি ও রোগবিনাশক্রম সকল, রোগী শুশ্রূষা, গৃহচিকিৎসা, পথ্যাপথ্য-বিধি, চিকিৎসক, পরিচারক এবং রোগীর কর্ত্তব্য, দিনচর্য্যাবিধি, ঋতুচর্য্যাপালন, ব্রহ্মচর্য্য ও সদাচারবিধি, দৈবদুর্ব্বিপাক হইতে আত্মরক্ষা, সংক্রামক ব্যাধি হইতে

আ.ণর উপায়, অন্ন পানীয় প্রস্তুত ও সে সমুদয়ের রক্ষা, দেহের প্রতি দ্রব্যের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া কৌশল, বাহ্যপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সাদৃশ্য স্থাপন, পৃথিবীস্থ ও দেহস্থ দ্রব্যনিচয়ের মূলতত্ত্ব সংবিভাগ ও তাহাদের উৎপত্তি এবং বিনাশক্রমসকল, জঙ্গম, উদ্ভিজ্জ ও পার্থিব যাবতীয় দ্রব্যগুণতত্ত্ব এবং দেহের প্রতি তাহাদের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা, একান্ত হিতকর ও একান্ত অহিতকর দ্রব্যের নির্ণয়, দীর্ঘজীবনলাভের উপায় ও লক্ষণ, মল, মূত্র, স্বপ্নদর্শন ও ইন্দ্রিয়গণের পরীক্ষা এবং তদ্দ্বারা স্বাস্থ্য ও জীবনের শুভাশুভ বিচার ও আয়ুর কালাকাল. নির্ণয় প্রভৃতি কত কত অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ যথার্থতত্ত্ব সকল উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলা একরূপ অসম্ভব।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান এমন গম্ভীরতত্ত্বপূর্ণ যে, ইহা আয়ত্ত করিতে পারিলে যেখানে যে দেশে যে কোন প্রকার শারীর, মানস বা আগন্তুক যে কোন অভ্রান্ত তত্ত্ব কেন আবিষ্কৃত না হউক, উহাই আয়ুর্ব্বেদের যুক্তির অনুকূলে আসিবে।

আয়ুর্ব্বেদের এক একটী সূত্র আলোচনা করিলে যে কত বিজ্ঞানরহস্য উদ্ভেদ হইয়া পড়ে, তাহাও সকলে চিন্তা করিবার অবসর পায় না। এই চিন্তার বীজ বপন করিতে হইবে। প্রাণের জন্য, সুখের জন্য, ধর্ম্মের জন্য ও অর্থের জন্য সকলকে এখন উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদতত্ত্বে যাঁহার যত টুকু পরাজ্ঞান লাভ হইয়াছে, স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও রোগপ্রতিকার সম্বন্ধে যিনি যে ভাবে যত টুকু সত্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, তিনি তাহাই নিয়া উপস্থিত হউন, আর যাঁহারা—পিপাসু, তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করুন। ইহা কাহারো নিজস্ব নহে, সেই অপার জ্ঞানসিন্ধু মহর্ষিদের রত্নভাণ্ডারের পুঞ্জসঞ্চিত রত্নরাজি, যাহাতে সকলেব সমান অধিকার রহিয়াছে। সকলে হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া, জগতের দুঃখ-দৈন্য দূর করিতে অগ্রসর হউন, ঋষিকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ হউক।

আয়ুর্ব্বেদের মৌলিকতা।

ইতিপূর্ব্বে অনেক প্রাচ্য পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে, ভারতবর্ষ, গ্রীস ও আরব দেশের নিকট ঋণী। অধিকাংশ প্রাচ্য পণ্ডিত রোম ও গ্রীস দেশীয় শাস্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অধুনা অনেক ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থের নষ্টোদ্ধার হইয়াছে এবং বৈদেশীকগণের লিপিবদ্ধ বিবরণে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। বিদ্যার্থীগণ তাহা পাঠ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যোতিষ, মনো-বিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতবাসী আর্য্যগণ যেরূপ পৃথিবীস্থ অন্য যাবতীয় জাতির পথপ্রদর্শক, চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়েও তাঁহারাই তদ্রূপ সর্ব্বপ্রথম জগতের সমক্ষে আলোক বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

পবিত্র পঞ্চনদ প্রদেশে বাসকরা কালে, ভারতীয় আর্য্যগণ পৃথিবীর অন্য যাবতীয় জাতিগণ অপেক্ষা সভ্যতার অনেক উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। ঐ সময় তাঁহারা অন্য জাতীয় লোকদিগকে অত্যন্ত কৃপার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। বস্তুতঃ, অন্য জাতীয় লোক সকল তৎকালে ভারতীয় আর্য্যগণ অপেক্ষা এত হীনতর অবস্থায় অবস্থিত ছিল যে, ভারতীয় আর্য্যগণ কোন বিষয়ে ঐ সকল জাতি হইতে কোন প্রকার শিক্ষা পাইতে পারেন, এরূপ ধারণা কখনও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। এই নিমিত্তই প্রাচীন হিন্দুগণ নির্জ্জনে ও অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বকীয় সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন এবং এই কারণেই পৃথিবীস্থ অপর জাতীয় সভ্যতার সহিত তাঁহাদের সভ্যতার কোন প্রকার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। উক্ত অবস্থানুসারে ভারতীয় আর্য্যগণ যে অন্য জাতি হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা কয়া যায় না।

পঞ্চনদ প্রদেশে ভারতীয় আর্য্যগণের সভ্যতার প্রথম অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহারা যুদ্ধকুশল, কৃষিজীবী, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং সুসভ্য ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সভ্য ও অসভ্য উভয় অবস্থাই মনুষ্যমাত্র রোগ শান্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। ইতর শ্রেণীস্থ জীবগণের মধ্যেও শারীরিক উপদ্রব প্রশমনের চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ চেষ্টা রীতিমত বিজ্ঞানে পরিণত হইয়া থাকে।

সর্ব্ববাদিসম্মত মতে হিন্দুদিগের ঋগ্‌বেদ জগতের প্রাচীনতম ইতিহাস বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। খৃষ্ট জন্মের অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহার জন্ম হওয়া সম্বন্ধে প্রাচ্য পণ্ডিতগণও এক বাক্যে মত প্রকাশ করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাই হিন্দু সভ্যতার প্রথম অঙ্কের ইতিবৃত্ত। ঐ সময় হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন হয় নাই। সমগ্র ভারতীয় আর্য্য জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি হলচালনা করিয়া কৃষিকার্য্য করিয়াছে এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের উপাসনা করিয়াছে, এবং আবশ্যক হইলে, প্রত্যেকেই অস্ত্রশস্ত্রসহ অসভ্যজাতীয় লোক দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় পরিবারবর্গ, কৃষিক্ষেত্রে, গোধন এবং সভ্যতার ফল রক্ষা করিয়াছে। ঋগ্‌বেদের এক ঋষি স্বভাবসুলভ বিষাদ-মিশ্রিত সরলতাসহকারে সোমলতার উপাসনায় বলিয়াছেন যে, "আমি স্তোত্র রচনা করি, আমাব পিতা চিকিৎসা ব্যবসায়ী এব জননী যাঁতায় শস্য পেষণ করিয়া থাকেন। গাভীগণ আহার অন্বেষণে গোচারণের মাঠে যেরূপ ইতস্ততঃ বিচরণ করে, আমরাও তদ্রূপ বিভিন্ন ব্যবসায় দ্বারা সোম দেবতার উপাসনা করিতেছি।" উক্ত গ্রন্থে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই মর্ম্মে উপাসনা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি এবং খঞ্জকে গতিশক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সোমলতারস, ওষধি এবং অপাঙ্গ বহু-রোগনিবারক বলিয়া বর্ণিত ও উপাসিত হইয়াছে।

ফলতঃ হিন্দুজাতীয় চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ মধ্যে চরক, সুশ্রুত, অষ্টাঙ্গহৃদয় এবং নিদানই রীতিমত বিজ্ঞান শ্রেণীতে আসন পাইবার যোগ্য। এই সমস্ত গ্রন্থ মধ্যে চরক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। কিন্তু চরকের পূর্ব্বে অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ চিকিৎসা বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কৃত গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। চরক অগ্নিবেশ

কৃত গ্রন্থকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়া প্রণীত হইয়াছে। চীন দেশীয় ত্রিপতক গ্রন্থে কণিষ্ক রাজার সভায় চরক নামক এক চিকিৎসক থাকার কথা উল্লেখিত আছে। ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, তিনি খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু এস্থলে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পাতঞ্জল নামক ঋষি চরক গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন এবং উক্ত ঋষি যে খৃষ্ট জন্মের অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। চরক পাঠে দেখা যায় যে, উহাতে মাত্র বৈদিক দেবতা ও মন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু পৌরাণিক দেবতার নাম গন্ধও নাই। বেদে যেমন মনুষ্যের কঙ্কাল সমষ্টির পরিমাণ ত্রিংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রোক্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানেও তাহার ঐ পরিমাণই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। বেদে চরক নামের উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু তথায় উহা ব্যক্তি বিশেষের নাম অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বংশ বিশেষের নাম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণ অনুসারে চরক শব্দের অর্থ চরকের শিষ্যবর্গ। খৃষ্ট জন্মের আট শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ ব্যাকারণ রচিত হয়। ইহা অধুনা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, চীন দেশীয় ত্রিপতক গ্রন্থের উল্লিখিত চরক নামধারী চিকিৎসক চরক নামক চিকিৎসাগ্রন্থের প্রণেতা নহেন; তিনি ঐ বংশীয় কোন ব্যক্তি, অথবা তাঁহার প্রদর্শিত চিকিৎসা প্রণালীর অনুবর্ত্তী ব্যক্তি হইবেন। এই গ্রন্থের ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল যে, তাহা পাঠ করিতে বসিলে, পাঠকের মনে স্বতঃই উদিত হইবে, তিনি যেন বেদের ব্রাহ্মণ পাঠ করিতেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়, হিমাচল প্রদেশস্থ চিত্রকর নামক বন-প্রদেশে প্রাজ্ঞজনদিগের এক সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় আত্রেয়, শাকুন্তের মৌদগল্য, কৌশিক, ভরদ্বাজ বিদেহাধিপ নিমি, ব্যাস এবং বাহ্লীক প্রদেশীয় কাঙ্কায়ন উপস্থিত ছিলেন। তথায় তর্ক বিতর্ক দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছিল, তাহাই চরক নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সুশ্রুত অস্ত্র-চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। কিন্তু ইহাই যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের ঐ জাতীয় প্রথম গ্রন্থ, তাহা নহে। ফলতঃ চরক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান তৎকালে কায়-চিকিৎসা এবং ধন্বন্তরী সম্প্রদায় এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। কায় চিকিৎসা বলিতে, শারীরিক চিকিৎসা এবং ধন্বন্তরী

চিকিৎসা বলিতে অস্ত্র চিকিৎসা বুঝায়। বেদেও ঐরূপ দুই বিভাগ থাকা দেখা যায়। হিন্দুগণ বলেন যে, দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মহাভারতে সুশ্রুতকে বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কাত্যায়ন নামক ঋষি খৃষ্টের অন্ততঃ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকৃত বার্ত্তিক গ্রন্থে সুশ্রুত নামের উল্লেখ আছে। সুশ্রুত পাঠে দেখা যায় যে, কাশিরাজ নামক মুনি উক্ত গ্রন্থের তত্ত্ব সুশ্রুতের নিকট প্রকাশ করেন। চক্রপাণি দত্ত ১০৬০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের যেটীকা প্রণয়ন করেন, তাহা ভানুমতী নামে বিখ্যাত। ডল্বনাচার্য্য নামক ব্যক্তি সাহানসাহ নামক নৃপতির রাজত্ব কালে জীবিত ছিলেন। তিনিও নিবন্ধ সংগ্রহ নামক সুশ্রুতের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। ডল্বনাচার্য্যের পূর্ব্বে গয়দাস, ভাস্কর ও মাধব প্রভৃতি মনস্বিগণ ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে টীকা প্রণয়ন করেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয় বাগ্‌ভট্ট কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। উহা চরক ও সুশ্রুত অবলম্বনে রচিত। হারীত ও ভেল নামক ব্যক্তিগণের গ্রন্থ হইতেও কতক তত্ত্ব উহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, যদি কোন গ্রন্থ প্রাচীন ঋষিগণের কৃত বলিয়া প্রামাণ্য রূপে গণ্য হয়, তবে ভেল প্রভৃতির গ্রন্থ অধীত না হইয়া কেবলমাত্র চরক ও সুশ্রুতের কৃত গ্রন্থ অধীত হওয়ার কোনই কারণ নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাগ্‌ভট্টের সময় চরক ও সুশ্রুত অত্যন্ত প্রাচীন অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য গ্রন্থকার নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। তিব্বত দেশীয় তাঞ্জুর নামক গ্রন্থে চরক সুশ্রুত এবং বাগ্‌ভট্টের উল্লেখ আছে। জর্জ্জ লুথ নামক প্রাচ্য পণ্ডিত গবেষণাদ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে। চীন দেশীয় টিসিঙ্ নামক ভ্রমণকারী আয়ুর্ব্বেদের অষ্ট বিভাগের প্রণেতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই অষ্টবিভাগ "অষ্টাঙ্গহৃদয়" ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রন্থের প্রারম্ভে বুদ্ধদেবের স্তোত্র লিখিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল পরাক্রমের সময় এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

মাধবকর নিদান নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাও চরক এবং সুশ্রুত অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। বৃন্দ নামক ব্যক্তি চিকিৎসা সম্বন্ধে সিদ্ধিযোগ নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা নিদান নামক গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত

হইয়াছে। চক্রপাণি দত্ত বৃন্দকৃত গ্রন্থের অনুকরণে স্বীয় নামধেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণিদত্ত কোন্ সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, হারুণ অল রশিদ নামক খলিফা খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদনগরে রাজত্বকালে চরক, সুশ্রুত ও নিদান আরব দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তাঁহার সভায় মঙ্ক ও সালে নামক দুই জন হিন্দু রাজচিকিৎসকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। সিরাপিয়ন, রাহাজেচ ও অভিসেন্না নামক আরব দেশীয় প্রাচীন লেখকগণ তাঁহাদের কৃত গ্রন্থে চরককে ক্রমান্বয়ে জাবক, স্ফিবক এবং স্কাবক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হাজি খলিফা নামক পণ্ডিত খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে অবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত "কিতাব অল ফেরেস্ত" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হারুণ অল রসিদ মঙ্ক নামক হিন্দু চিকিৎসক দ্বারা সুশ্রুল নামক গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়া ছিলেন। এই "সুশ্রুল" যে সুশ্রুত নামের অপভ্রংশ মাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ করার অণুমাত্রও কারণ নাই।

মাসিডনের সুপ্রসিদ্ধ রাজা আলেকজাণ্ডার হিন্দু চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে গ্রীস দেশীয় চিকিৎসক সম্প্রদায় যে সমস্ত রোগ অপনয়ন করিতে অসমর্থ হইত, হিন্দু চিকিৎসকগণ তাহা অনায়াসে আরোগ্য করিতেন। নিয়রকস যে সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সর্পদংশন রোগে গ্রীস দেশীয় চিকিৎসকগণের অণুমাত্রও অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু হিন্দুগণ তাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইত। আরিয়ান বলেন যে, গ্রীস দেশীয় লোকেরা পীড়িত হইলেই হিন্দু চিকিৎসকগণের শরণাপন্ন হইত এবং তাঁহারা অদ্ভুত কৌশলে তাহাদের রোগ দূর করিয়া দিতেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু চিকিৎসকগণই সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতবীয় ঔষধের আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদের প্রণীত অস্ত্র-চিকিৎসা শাস্ত্রে ১২৭ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ ও কঠিন কঠিন রোগ সম্বন্ধে অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা বর্ণিত আছে। হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বায়ু, পিত্ত, কফ এই ধাতু দ্বারা মানব দেহ নির্ম্মিত এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও উক্ত তিন ধাতুর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে প্রকাশ পায় যে, মনুষ্য শরীরস্থ

ধাতু বিপর্য্যয় দ্বারা রোগের উৎপত্তি হয়। পানিনিকৃত ব্যাকরণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রয়োগ থাকা দেখা যায়, এবং তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, গ্রন্থকর্ত্তার জীবিতকালে ভারতবর্ষে রীতিমত চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

গ্রীস দেশীয় চিকিৎসকগণ বলেন, পিত্ত কফ শোণিত এবং জল এই চারি পদার্থ দ্বারা মনুষ্য শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। পিথে গোরাস নামক পণ্ডিত গ্রীস দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে হিন্দু-চিকিৎসকগণের যে সময় নিরূপণ করা গিয়াছে, গ্রীস দেশীয় প্রথম চিকিৎসক তাহার অনেক পরবর্ত্তী।

বস্তুতঃ, হিন্দু সভ্যতার প্রথম অবস্থায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করা পরিলক্ষিত হয় না। যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এতদ্দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান সঙ্কলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অথর্ব্ববেদই সর্ব্বপ্রধান। উক্ত গ্রন্থে যাদু-বিদ্যা, প্রেত বিদ্যা, বশীকরণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বিষয়ের অবতারণা আছে; এবং প্রকৃত চিকিৎসাতত্ত্ব ঐ সকলের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। পবিত্রচেতা ভারতীয় আর্য্যগণ এ নিমিত্তই অথর্ব্ববেদকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। চরকের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই ঐ তাচ্ছিল্য ভাব বিদূরিত হইতেছিল; এবং তন্নিমিত্তই ঐ গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে অর্থর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ এবং দেবতাগণের প্রকাশিত তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। সুশ্রুতের সময় চিকিৎসা শাস্ত্র এরূপ আদরণীয় হইয়াছিল যে, ঐ গ্রন্থের প্রণেতা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অনাদি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ-স্বরূপ সৃষ্টি করা বলিয়া বর্ণনা করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উহার অশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। যে কারণেই হউক, জ্যামিতি জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের ন্যায় কালক্রমে উহার অধঃ-পতন হইতে আরম্ভ হয়। অনেকে অনুমান করেন যে খৃষ্টীয় দশম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ঐ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। ইংরেজ জাতির আগমনের সময় ভারত-বর্ষে এই শাস্ত্রের এত অবনতি সংঘটিত হইয়াছিল যে, মোগল সম্রাটগণ পীড়িত হইলে, হিন্দুচিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া, ইংরেজ ডাক্তারের শরণাপন্ন হই-

তেন। অস্ত্রচিকিৎসার এত অবনতি ঘটিয়াছিল যে ঐ ব্যবসায় অশিক্ষিত ক্ষৌরকারবর্গের এক চেটিয়া হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতায় যখন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়, তৎকালে শবচ্ছেদ সম্বন্ধে হিন্দু ছাত্র মণ্ডলী ও তাহাদের অভিভাবকগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল ঐ সময় সৎসাহসী ৺ মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় সর্ব্ব প্রথম শবচ্ছেদন করিয়া এ দেশীয় ছাত্রবর্গের কুসংস্কার দূর করিয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৎকালে এই কার্য্য এত অসাধারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল যে, মধুসূদনের সম্মানার্থ শবচ্ছেদন সময়ে তোপধ্বনি করা হইয়াছিল।

আধুনা ভারতবর্ষে নবজীবনের সঞ্চার দেখা যাইতেছে। এ সময় আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ-প্রদত্ত এই অমূল্য বিজ্ঞান আলোচনা করা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এতদ্দারা কেবল ভারতবর্ষের নহে, সমস্ত জগতের উপকার সাধিত হইবে। অপিচ নূতনতত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা অধ্যয়নার্থীর জ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইবে।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত বি, এল,।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান ও রসায়ন।

বিবিধ বিদ্যার বিলাসভূমি ভারতবর্ষে নাই কি? সকলই আছে। "যা নাই ভারতে তা নাই জগতে" যাহা ভারতে নাই তাহা কোথাও নাই, দেশে এই প্রবাদবাক্য প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, শিল্প সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, পুরাবৃত্ত, প্রত্নতত্ব, প্রাণীতত্ব, মনস্তত্ব, দেহতত্ব, ইত্যাদি কত তত্ত্বের নাম করিব? সকলেই বলিয়া আসিতেছেন এদেশে এককালে কিসের অভাব ছিল? একথা আজ নূতন নহে; পুরাতন,—অতিপুরাতন। ইহাই কেবল আবৃত্তি করিয়া কত কত মহাজন কালসাগরে মিলাইয়া যাইতেছেন। সকলই ছিল বুঝিলাম, কিন্তু খুঁজিলে পাই কি? আজ আমরা মণিহারা ফণীর ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিতেছি। কিন্তু সে বৃথা চিৎকারের আর সময় নাই। আর সেকালের কথা বলিয়া শূন্যগর্ভ দর্প করিলেও চলিবে না, এখন সাধনা ও সিদ্ধির প্রয়োজন।

শুনিতে পাই পূর্ব্বসুখস্মৃতি মানবকে মহান্ করিয়া তুলে। যাহাদের হৃদয় মন্দিরে অতীত-বিভব স্মৃতি ফলিত না হয়, তাহারা নাকি উন্নতির উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। ইহা সত্য বটে কিন্তু আজ কেবল সে কথা ভাবিলেও চলিবে না। তোমার পুরোভাগে অনন্ত কর্ত্তব্য নিত্য অননুষ্ঠিত রহিয়া যাইতেছে, যদি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ এবং বোঝ, তবে আর দুর্ব্বলের প্রলা-পোক্তি মুখে আনিয়া পুণ্য কি? এসংসার অসীম; অবাধ কর্ম্মক্ষেত্র, জীবন কর্ম্মময়, জ্ঞানময় ও বৈচিত্র্যময়। ভীষণ আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ঘাত, প্রতিঘাত, স্থিতি এবং লয়; ইহাই সৃষ্ট জগতের অন্তর্গূঢ় অর্থ। ইহাদের মধ্যদিয়া চাই কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈচিত্র্য; আর আকর্ষণ প্রতিঘাত ও স্থিতি।

আমরা চাই এক কেন্দ্রে তিনটি আলম্বন। তিন খানা যষ্টি কেন্দ্রে স্থাপিত হইলে সমস্ত ভার সহনক্ষম হয়। সে তিন খানা যষ্টি আমাদের বিশিষ্টরূপে লইতে হইবে। জগতের মুখ্য—মানবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা,—প্রাণ, অর্থ, ধর্ম্ম। প্রাণে চাই স্বাস্থ্য, অর্থে সুখ, ধর্ম্মে স্থিতি। সেই প্রাণার্থধর্ম্ম কি, কোন্ সাধনায় তাহা পাইতে পারি, কোন্ মন্ত্রে তাহাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারি, তাহাই চিন্তার বিষয়। জগৎ ইহাদের জন্যই অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে।

আমরা চাইনা অতীতের জীর্ণাস্থিপঞ্জর; চাইনা ভবিষ্যের ভুবন-বিমোহিনী কল্পিতা মূর্ত্তি। আমাদের সম্মুখে অনন্ত মহান্ কর্ত্তব্য বিরাজমান। আমরা অতীতের অন্ধকারে যেন দিশাহারা না হই; স্মরণাতীত কালের সুখ-স্মৃতিতে ও যেন উন্মনা হইয়া না উঠি এবং ভবিষ্যের আকাশকুসুম ও যেন কল্পনা করিয়া না বসি। তবে কি চাই? চাই শুধু সম্মুখের বরাভয়-বরদ-বিগ্রহ। বর চাইতেছিনা, সুতরাং পাইতেও পারিতেছিনা। সত্য সত্যই যদি আমরা কায়মনঃপ্রাণে বরাভিলাষী হই, তবে নিশ্চয়ই কামনায় সিদ্ধি হইবে।

পরের দাবী তুমি করিও না, নিজের দাবী নিজে কর, নিজের অভাব কতটুকু দেখ, নিজের হিতেই বিশ্বহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পুরুষের যা, ছিল, দেখ, তাহার কতটুকুর দাবী তোমার আছে? নিজে সঞ্চয় কর, ভোগ কর এবং উত্তরাধিকারীর জন্য সযত্নে রাখিয়া দাও। গৃহের ধন বৃদ্ধিকর; বিতরণ কর; বাহিরের সম্পদ্ খুঁজিয়া ঘরে লও এবং সযত্নে রক্ষাকর। সাবধান কাচে কাঞ্চন ভ্রমে আপনি বঞ্চিত হইও না বা অন্যকেও বঞ্চনা করিতে যাইও না, দেখিবে আপনা আপনি দৈন্য ঘুচিয়া যাইতেছে।

সকলেই আজ অল্পপ্রাণ, অল্পধন ও অল্পধর্ম্ম, তাই আমরা প্রাণ, ধন এবং ধর্ম্ম কামী। বহুদিন আমরা আঁধারে মজিয়াছি। আজ সে আঁধার নাই। সকলই দেখি, সকলই শুনি, সকলই বুঝি, কিন্তু দেহের মালিন্য কাটে নাই, জড়তায় জর্জ্জরিত। ক্ষীপ্রতার ক্ষারযোগে মালিন্য দূর করিতে হইবে। অধ্যবসায়ের অসিদ্বারা অবসাদকে ছিন্ন করিতে হইবে। তবেই ত কর্ম্মের সন্ধান,জ্ঞানের সন্ধান ও বৈচিত্র্যের বিধান করিতে সমর্থ হইব।

আজ আমরা সর্ব্বাগ্রে প্রাণকামী। ধন ও ধর্ম্মের কথা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে বুঝিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাণে চাই স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যে চাই দীর্ঘজীবন,

দীর্ঘজীবনের সহিত চাই কর্ম্ম, জ্ঞান আর বৈচিত্র্য। সেই সুখময় জীবন পালনে কর্ম্মজ্ঞান বৈচিত্র্য কি, তাহাই আজ সর্ব্বত্র জিজ্ঞাসা। কর্ম্মেতেই জ্ঞান, জ্ঞানেই বৈচিত্র্য আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবন আছে কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম আছে ত জ্ঞান নাই, জ্ঞান থাকিলেও বিজ্ঞান কোথায়? বিজ্ঞানেই বৈচিত্র্য এবং সুখ বিদ্যমান। কিসের ভিতর দিয়া আমরা সেই পরম পদার্থ—পুণ্য নিকেতন কর্ম্মজ্ঞান বৈচিত্র্যময় সুখময় প্রাণকে লাভ করিতে পারিব তাহাই লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার বিশ্রান্তি কোথায়? লক্ষ্য—জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈচিত্র্য ও স্বাস্থ্যময় আয়ত প্রাণামৃতের মন্দাকিনী। যাঁহার পুণ্য-পীযুষপ্রবাহ পরম্পরায় পবিত্র হইয়া, এক সময় বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ট, বাদারায়ণ, ভার্গব ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, চ্যবন, গার্গ্য, আত্রেয় মৈত্রেয় পতঞ্জলি প্রভৃতি মহামনীষী মহর্ষিগণ জগৎকে কর্ম্মময়, জ্ঞানময় ও বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাঁহাদের সেই বিভব-বৈচিত্র্য আজ বিশ্বব্যাপিত। আ-ব্রহ্মাণ্ডের লোক যেই অমৃতরাশি বিভাগ করিয়া লইয়া অসংখ্য পূতপ্রস্রবণ বহাইয়া দিতেছেন; আমাদের জন্য কি তাহার কণামাত্রও বিদ্যমান নাই? যদি থাকে তবে সেই কণিকাকেই কর্ম্ম-প্রবাহে ফেলাইয়া; দুগ্ধে নবনীতের ন্যায় যথাকালে সর্ব্বসমন্বয়ে কেন সারোদ্ধার করিয়া লই না? আমরাও কি সেই পীযুষের পূতপ্রস্রবণ দ্বারা সনাথীকৃত হইতে পারি না? জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যের খনি আয়ুর্ব্বেদের সাহায্যেই আমরা সে সমুদায় লাভ করিতে সক্ষম।

মানব—শুধু মানব কেন, প্রাণীমাত্রেই সুখান্বেষণে সতত নিরত। সেই সুখের মূল আরোগ্য। তাহার একমাত্র অন্তরায় রোগ বা দুঃখ। রোগ সমস্তই অমঙ্গলের নিদান ও প্রাণঘাতী। ঋষিগণ বলিয়াছেন:—

"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সোর্জীবিতস্য চ॥"

(ক্রমশঃ)

বসন্তরোগ ও তাহার প্রতিকার।

বসন্ত রোগটী যে কি তাহা জানে না এমন লোক খুব কম। তথাপি আজ আমরা এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বিগত ১৩১৯ সালে এদেশের নানা স্থানেই বসন্ত রোগের বিষম প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ও এই রোগের প্রকোপ নিতান্ত কম নহে। অনেকেরই বিশ্বাস যে বহু বৎসর যাবৎ এদেশে এমন বসন্তরোগের প্রকোপ দেখা যায় নাই। শুধু বাঙ্গালা দেশেই যে রোগ বেশী তাহা নহে। পুনা প্রভৃতি নানা স্থানেই এ রোগের ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

এই রোগ প্রধানতঃ বসন্তকালে হয় বলিয়াই ইহার বসন্ত নামটি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে ইহার সাধারণ নাম মসূরিকা। বসন্ত এই নামটি হারীত সংহিতা ব্যতীত অন্য কোন প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেখা যায় না। হারীত সংহিতা এই জাতীয় রোগকে উপসর্গ-রোগ নামে অভিহিত করিয়া ক্ষুদ্রতর, অন্তক, মসূরিকা ও বসন্ত এই চারিটি শ্রেণী ভেদ করিয়াছেন। চরকে এই জতীয় কোন রোগেরই উল্লেখ নাই। ভাব প্রকাশ নামক গ্রন্থে ইহার শীতলা নামে এক শ্রেণী ভেদ করা হইয়াছে। দেখা যায় এই রোগ বসন্তকালের প্রথম হইতেই আরম্ভ হয় এবং গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া বর্ষা আসিলেই কমিয়া যায়। ইহা ভয়ঙ্কর সংক্রামক ব্যাধি। কোথাও একজনের হইলে তাহাদের সংস্পর্শে যত লোক থাকে, প্রায় সকলেরই এই রোগ হইতে পারে। প্রথম এক বাড়ীতে হইয়া ক্রমে সমস্ত গ্রাম ও সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া পড়াও বিচিত্র নহে। এই রোগ প্রতিষেধের জন্য লোকে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বসন্তকাল না আসিতেই এজন্য বিশেষ সতর্ক হয়।

অনেকের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে শীতঋতুর পরিবর্ত্তনের সময় ও বসন্তকালে অতিরূক্ষ ও উষ্ণ আহারাদি হইতেই এ রোগ জন্মিয়া থাকে। এজন্য পূর্ব্ব হইতেই উষ্ণ বা পিত্তনাশক শীতল ও তিক্ত দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। শীতল দ্রব্য সেবা করিলে এ রোগের শান্তি হয় এজন্যই বোধ হয় ইহার এক নাম শীতলা। ক্রমে এই নাম আয়ুর্ব্বেদেও প্রবিষ্ট হইয়াছে।

গর্দ্দভ বাহনা শীতলাদেবীর পূজাদিরও অনুষ্ঠান এদেশে কম নহে। যাজনিক ক্রিয়া কাণ্ড শাস্ত্রে শীতলা দেবীর স্তব ও পূজার মন্ত্র সকল বর্ণিত হইয়াছে। শীতলা পূজা ও স্তবে এ রোগের শান্তি হয় ইহার অন্য ঔষধ নাই এমন ধারণা ও সাধারণে বিশেষ বদ্ধমূল। আয়ুর্ব্বেদেও ইহার কতকটা সমর্থন আছে।

এক সময় এই রোগ এমন সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিত যে, লোকে অন্য রোগকে রোগ বলিয়াই মনে স্থান দিত না। তখন বহুজনপদ এই রোগে জনশূন্য হইয়াছে। এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এ রোগের মহামারী দেখা যায়। পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে এ রোগ কিছু দিনের জন্য একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়া ছিল। কিন্তু জানিনা কোন্ পাপে বিধাতার শাপে রোগ আবার প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে।

মানুষ ও গোরুতেই এ রোগটি বিশেষ দেখা যায়। অনেকে বলেন,গোরুরই প্রথমে এই রোগ সৃষ্টি হইয়া পরে মানুষে সংক্রামিত হয়।

বসন্তরোগের যখন অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল, সে সময় ইহার প্রতিকারের কোন প্রকৃষ্ট পন্থা কোন দেশীয় চিকিৎসক ও নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ক্রমে অভিজ্ঞতার ফলে যখন দেখা গেল, একবার যে ব্যক্তির বসন্ত হইয়াছে পুনঃ বহু কারণ সত্ত্বেও তাহার প্রায় বসন্ত হয় না। তখন কৃত্রিম উপায়ে মানব শরীরে বসন্ত জন্মাইয়া এ রোগের হ্রাসের সূচনা করা হয়। এই প্রথাকে "টিকা দেওয়া" বলে। চিকিৎসাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ও চীন দেশে প্রথম টিকার প্রচলন হয়। পরে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্যদেশেও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ বসন্তগ্রস্ত মনুষ্যদেহ হইতে বসন্তের বীজ নিয়া অপর সুস্থ ব্যক্তির দেহে সেই বীজ এমত ভাবে লাগান হইত, যেন তাহাদ্বারা মৃদুভাবে বসন্ত প্রকাশ পায় অথচ রোগীর কোন অনিষ্ট না হয়। এই নিয়মকে নৃ-মসূর্য্যাধান বা বাঙ্গালা টিকা বলে। এইরূপ টিকা দেওয়ার পর অনেকে বসন্ত রোগে আক্রান্ত ও সামান্য অনবধানতায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইত, কিন্তু টিকা লওয়ার পর যাহারা স্বাস্থ্য লাভ করিত, তাহাদের প্রায়ই পুনঃ বসন্তাক্রমণের ভয় থাকিত না। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেই এই প্রথাটি এদেশে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালা টিকা লইতে হইলে বহু কঠোর আচার নিয়ম পালন করিতে হইত ও তাহা বহু আয়াস ও অনুষ্ঠান সাপেক্ষ ছিল। বিশেষতঃ এই নিয়মের ফলে অনেক সুস্থ ব্যক্তিও বসন্তে

আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত, কখনও বা মহামারী দেখা দিত। যুবকগণ প্রাচীনদের নিকট এইরূপ টিকা দেওয়ার গল্প শুনিয়া থাকিবেন।

এইরূপ টিকার ফল অনেক সময় বিপজ্জনক দেখিয়া আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে আইন করিয়া বাঙ্গালা টিকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন এবং পাশ্চাত্য প্রণালীতে গো-বীজে টিকা দেওয়ার বিধি প্রবর্ত্তন করেন। ইহার নাম গো-মসূর্য্যাধান বা ইংরাজীটিকা। ইহাতে বিশেষ কোন আচার নিয়মের আবশ্যক হয় না, অথচ কোন প্রকার বিপদেরও আশঙ্কা থাকে না। তবে অনেকের বিশ্বাস বাঙ্গালা টিকা হইতে ইংরেজী টিকার শক্তি কম। দেখাও যায় ইংরেজী টীকা দেওয়ার পরও অনেকের বসন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু হইলেও তাহা তেমন মারাত্মক হয় না। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস ও দেখা যায় যে, যাহাদের বাঙ্গালা টিকা হইয়াছে তাহাদের প্রায়ই বসন্ত হয় না। তাহার আর একটি পরীক্ষা এই, ঐ সকল ব্যক্তিকে ইংরেজী টিকা দিলেও তাহা উঠে না। যাহারা ইংরাজী টিকা দিয়াছে, তাহাদের কিন্তু অনেকেরই পুনঃ ইংরাজী টিকা উঠিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়া প্রজা সাধারণকে টিকা লইতে বাধ্য করিয়া দেশের অশেষকল্যাণ সাধন করিয়াছেন। অনেক অশিক্ষিত লোক উপযুক্ত সময়ে টিকা না লইয়া তাহার বিষময় ফল ভোগ করিয়া থাকে, এরূপ অনেক ঘটনা শুনা যায়। অনেক অভিজ্ঞব্যক্তি বলেন এই টিকা লওয়ার ফলেই এদেশে বসন্ত রোগের ভয় একরূপ চলিয়া গিয়াছে।

অনেক চিকিৎসক বলিয়া থাকেন যে, প্রতি বৎসর বসন্তরোগ আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই সকলের টিকা লওয়া উচিত, এই উপদেশ মানিয়া যাহারা টিকা লইয়া থাকে তাহাতে দেখা যায়, কাহারো টিকা বেশ প্রকাশ পায়, কাহারো আদৌ টিকা উঠেনা। ইহাতে বেশ বুঝা যায়,যাহার শরীরে পূর্ব্বপ্রদত্ত টিকার বীজ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে, তাহারই টিকা উঠে না। টিকা না উঠিলেও টিকা লইতে কোন হানি আছে তাহার বিশেষ কোন যুক্তি প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

বসন্তরোগ যে বসন্ত কাল ভিন্ন অন্য কালে হয় না এমন কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। তবে অন্যকালে খুব কম হয়; হইলেও তেমন বিস্তার হয় না।

অন্য দেশের কথা বলিতে পারিনা কিন্তু গত বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানেই বর্ষাকাল হইতেই বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছে। অনেক স্থানেই সংক্রামক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ও বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বর্ষায় আরম্ভ হইয়া সমস্ত শীতকাল, বসন্তকাল এবং বর্ত্তমান গ্রীষ্মকাল, ক্রমেই ইহার প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। এমন প্রায় গ্রাম বা নগর দেখা যায় না যেখানে ইহার প্রকোপ না আছে। ঢাকায়ও এ রোগের প্রকোপ নিতান্ত কম নহে। এবার অনেকেই এজন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রাচীনগণ বলেন, বহু বৎসরের মধ্যে ঢাকা জেলায় এরূপ বসন্তরোগ দেখা দেয় নাই।

বিগত বৎসর যে কোন না কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করিয়াছিলেন। তাহার বিশেষ কতগুলি কারণও বিদ্যমান ছিল। বসন্ত বিসূচিকা (কলেরা) "প্লেগ", (আয়ুর্ব্বেদে অগ্নিরোহিণী) প্রভৃতি ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগ। প্রায় এই সকল রোগেরই মহামারী উপস্থিত হয় এবং ইহাতে অনেক জনপদ একবারে লোক-শূন্য হইয়া পড়ে। এজন্য আয়ুর্ব্বেদে এই অবস্থাকে জনপদোদ্ধংস বলা হইয়াছে।

দেশস্থ জলবায়ু ভূমি প্রভৃতি দূষিত হইলে বা ঋতুবিপর্য্যয় ঘটিলে অর্থাৎ এক ঋতুতে অন্য ঋতুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, যেমন শীতকালে শীতের অভাব বা বর্ষাকালে বৃষ্টির অভাব হইলে মানুষের জীবনী শক্তি, ঔষধি ও অন্নপানীয় সমূহের শক্তির লাঘব হয়। তখন দূষিত জলবায়ু প্রভৃতি দ্বারা কোন সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলেই দেশের ভীষণ অবস্থা উপস্থিত হয়।

জল, বায়ু, ভূমি, দেশ, কাল প্রভৃতি বিকৃতভাবাপন্ন হইলে; যে সকল লক্ষণ হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আয়ুর্ব্বেদে উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে এ প্রবন্ধে তাহা বলা হইল না।

বসন্ত রোগের এইরূপ প্রাদুর্ভাবের কোন কারণ আছে কিনা, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যা'ক্। যে কোন সংক্রামক রোগেরই এক একটা বিশিষ্ট কারণ ঘটিয়া থাকে। সকলেই অবগত আছেন ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালে এদেশের প্রায় সকল স্থানেই এক প্রকার বিষাক্ত 'বিছা' জন্মে সেইগুলি আম গাছের পাতা খাইয়া রেশম কীটের ন্যায় অবিকল রেশমের বাসা প্রস্তুত করিতেছিল এবং ব্যবসায়ীগণ সেই সমুদায় বাসা সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে পাঠাইয়াছে।

এত বিছা হইয়াছিল যে, তাহাদ্বারা লক্ষ লক্ষ আম গাছ একবারে পত্রপল্লব শূন্যহইয়া পড়িয়াছিল। সেই বিছা কোন প্রকারে শরীরে লাগিলে অগ্নিদাহের মত যন্ত্রণা হইত ও সেই স্থান ফুলিয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিত। কোন কোন বাড়ীতে এমন উপদ্রব হইয়াছে যে, গৃহস্থ বাড়ী ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছিল। অবশ্য এখন সেই বিছার উপদ্রব হ্রাস হইয়া গিয়াছে। পাতা খাইয়া বিছা যেই মল ত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত গাছের তলায় বিষ্ঠার স্তর পড়িয়াছিল। এই কীট বসন্তের অন্যতম কারণ কিনা তাহাও চিন্তার বিষয়।

বিছা না হইলে যে বসন্ত হয় না এমন নহে। তবে যখন যখন বসন্তের মহামারী উপস্থিত হয় তখনই তাহার ঋতু বিপর্য্যয়াদি একটা না একটা কারণ থাকেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিছাকীট জন্মানের কারণ কি দেখিতে হইবে, এবং তাহা শুভ কি অশুভ। সাধারণ কথায় বলে "বিছার বার মিছা" অর্থাৎ দেশে বিছা হইলে সে বৎসর ফল শস্যের অভাব ও নানা রোগে দেশ প্রপীড়িত হয়। কার্য্যতঃ ও তাহা সকলে দেখিতেছেন। এবার এদেশে আম একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে, কলেরা বসন্ত ও জ্বর প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব ও কম নহে। প্রথমতঃ ঋতুবিপর্য্যয়াদি দোষে বায়ু দূষিত হয়। সেই বায়ুর সংস্পর্শে জল ও জল দ্বারা ভূমি বা দেশ দূষিত হইয়া, নানা প্রকার বিষাক্ত মশক টকী ও লতা গুল্মাদি জন্মিয়া সংক্রামক রোগ সকল সৃষ্টি করে। ঐপ্রকারে দূষিত বায়ু সেবনে জ্বর, দূষিত জল পানে ওলাউঠা, এবং ঐ জল স্নান প্রভৃতি দ্বারা শরীরে লাগিলে বিসর্প বসন্ত প্রভৃতি, দূষিত ভূমিতে বাস করিলে বা বিষাক্ত মশকাদি দংশন করিলে বিষম জ্বর (ম্যালেরিয়া) প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং তাহা ক্রমে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। (কিরূপে জল বায়ু ভূমি দূষিত হইয়া মহামারী উপস্থিত করে সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখন বসন্ত রোগের চিকিৎসা ও সংক্রামকতা নিবারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিত বলিব। যখন শুনা যায় যে, নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বসন্ত হইয়াছে, তখন হইতেই সকলের বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। বিশুদ্ধ জল বায়ু সেবন, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা, লঘু নির্দ্দোষ নিয়মিত আহার কিঞ্চিৎ শ্রম ও মনের সন্তোষ সর্ব্বাগ্রে পালনীয়।

যতদূর সম্ভব সেই রোগীর সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবে। খালী গায় বাহির হওয়া উচিত নহে। স্নানে ও পানে যে জল ব্যবহার করা যায়, সেই জলে কোন প্রকার বসন্ত রোগীর বীজ না থাকিতে পারে অর্থাৎ বসন্ত রোগীর শুশ্রূষাকারীরা তাহতে স্নানাদি না করে বা রোগীর বস্ত্রাদি প্রক্ষালন না করে। মাছি দ্বারা এ রোগ বিশেষ সংক্রামিত হয়, এজন্য আহার্য্য বস্তুতে মাছি না পড়ে সেজন্য দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অনেকেই বসন্ত দেখা দিলে কেবল শীতল দ্রব্য সেবন করিতে উপদেশ দেন, বস্তুত তাহা ঠিক নহে। ঐ সময়ে জ্বর না হইতে পারে সে জন্যই বিশেষ সাবধান হইবে, জ্বর হইলেই শরীরে কোন না কোন প্রকার হাম বসন্ত বা জল বসন্ত উঠিয়া থাকে। এজন্য অতি উষ্ণ বা অতি শীতল দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। দুগ্ধ ও অন্যান্য জলীয় দ্রব্য অধিক না খাওয়াই ভাল। গোরুর বসন্ত হইলে সেই গোরুর দুগ্ধ পান করিলে ও বসন্ত হইতে পারে।

বাজারের কোন দ্রব্য কিনিতে হইলে জানিয়া শুনিয়া কিনিবে, যেন বসন্ত রোগগ্রস্ত বাড়ীর উৎপন্ন সামগ্রী না হয়। এই রোগ দেশে আরম্ভ হইলে মৎস্য, মাংস, শাক, দূষিত জলে স্নান ও সে জল পান একবারে বর্জ্জন করা উচিত। অনেকে বলেন গাধার দুগ্ধ কিছু কিছু খাইতে পারিলে বসন্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকেনা। গাধার দুগ্ধ এদেশে একরূপ দুর্ঘট। যাহা ও পাওয়া যায় সকলের পক্ষে তাহা পাওয়া অসম্ভব। এরূপ স্থলে গাধার অল্প দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া সেই দুগ্ধে কতক চাউল ভিজাইয়া প্রতি দিন তাহার এক একটী খাইলে ও নাকি দুগ্ধ খাওয়ার ফল পাওয়া যায়। ইহা তেমন অসম্ভব নহে। এরূপ প্রবাদও আছে যে, যেসকল স্থানে অধিক গাধা থাকে বা যাহারা গাধা পালন করে সে সব স্থানেও বসন্তরোগ হয় না। এই জন্যই বুঝি গর্দ্দভ বাহনা শীতলার আরাধনায় ব্যবস্থা প্রচালিত হইয়াছে। গর্দ্দভ দুগ্ধের সহিত বসন্ত নিবারণের সম্বন্ধ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান সম্মত কিনা, তাহা আমরা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিব। কেহ কেহ প্রচার করেন কুম্ভীরের ডিম এ রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। আয়ুর্ব্বেদে ইহার অনুকূল যুক্তি দেখিতে পাই না। কোন কোন ব্যক্তি বসন্তের প্রতিষেধক ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন।

সেই সমস্ত ঔষধের শক্তিতে কখনও এক বৎসর কখনও বা চিরকাল বসন্ত হয়না এরূপ প্রকাশ। আমরাও এরূপ দুইটি ঔষধ জ্ঞাত আছি, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। টাট্‌কা কণ্টকারীর মূল সমপরিমাণ গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে এক বৎসর মধ্যে বসন্ত হয় না। দ্বিতীয়টি এই,—পুনর্নবার মূলচূর্ণ ও গোলমরিচচূর্ণ সমপরিমাণ লইয়া জলসহ সেবন করিলে কোন কালেই বসন্ত হইতে পারে না। এই ঔষধ দুইটি নির্দ্দোষ বলিয়া সকল বয়সে, সকলের পক্ষেই উপযোগী। দ্রব্যগুণ আলোচনা করিলেও ইহার উপযোগীতা কতকটা স্বীকার করা যায়। উক্ত ঔষধ দুইটির মাত্রা শিশু যুবা ভেদে এক রতি হইতে এক আনী পর্য্যন্ত ব্যবহার করাতেও দোষ আছে মনে করি না। ইহা ব্যবহার করিয়া সকলেই তাহার ফলাফল সাধারণে প্রকাশ করিলে সত্য উদ্ধার হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদের কোন কোন গ্রন্থে বসন্ত রোগ না হওয়ার কয়েকটি উপায় লিখিত হইয়াছে, তাহা এই :—

১। তেলাকুচ, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস, (বেত) ইহাদের পাতার কাথ পর্য্যুষিত করিয়া পান করিলে বসন্ত হওয়ার ভয় থাকে না। চৈত্র মাসে এই কাথ সেবন করিতে হয়।

২। চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে শুভ্রবর্ণ কলসে লোহিতবর্ণ পতাকাযুক্ত সিজবৃক্ষের শাখা স্থাপন করিয়া বাটীতে রাখিলে সেই বাটীতে বসন্ত রোগ হইতে পারে না। অনেকে বাটীর দক্ষিণ দিকে অথবা গৃহের ছাদে এইরূপ কলস স্থাপন করিয়া থাকেন।

৩। স্ত্রীলোকদের বাম পার্শ্বে এবং পুরুষদের দক্ষিণ পার্শ্বে হরীতকীবীজ (কাহারও মতে শৃগালের অস্থি) ধারণ করিলে বসন্তরোগ আক্রমণ করিতে পারে না। হরীতকীবীজ বাহুতে অথবা কোমরে ধারণ করিতে দেখা যায়। (শৃগালাস্থির ব্যবহার নাই। এ যুক্তি ও অপ্রশস্ত মনে হয়।

শীতলা নামে এক প্রকার বসন্ত আছে, তাহার আক্রমণ নিবারণের জন্য শাস্ত্রে আর কয়েকটী ঔষধ আছে। যাহারা নিম, বহেড়ার বীজ ও হরিদ্রা শীতল জলসহ পেষণ করিয়া পান করে, তাহাদের কখনও শীতলা রোগ হয় না। মোচার রস (কলাগাছের গুঁড়ির রস) দ্বারা শ্বেতচন্দন, অথবা বাসক বা মালতী

পত্রের রসদ্বারা যষ্টিমধু পেষণ করিয়া পান করিলেও শীতলা রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। শেষোক্ত তিনটি মুষ্টিযোগ শীতলারোগ হওয়ার পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিতে পারিলে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে রোগের বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। এই শীতলা প্রতিষেধক ঔষধ অন্য জাতীয় বসন্তপ্রতিষেধক কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই। কোন কোন চিকিৎসক বলেন, সর্ব্বজাতীয় বসন্ত নিবারণের জন্যই এই সকল ঔষধ ব্যবহার করা যায়। দ্রব্যগুণ আলোচনা করিয়া এসম্বন্ধে বিশেষ মতামত ক্রমে প্রকাশ করা হইবে। এই সকল ঔষধ সুস্থ শরীরের পক্ষেও কিছুমাত্র অনিষ্টজনক নহে। সকলেই নির্ভয়ে এই ঔষধের যে কোনটি ব্যবহার করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

পরমায়ু।

(শ্রীযুক্ত ললিতারমণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

আহারবিধি।

১। স্নানান্তে বিশ্রাম না করিয়া কখনো আহার করিবে না।

২। আহার করিবার পূর্ব্বে প্রস্রাব করিবে ও পদাদি ধৌত করিবে।

৩। সাত্ত্বিক বস্তু আহার দীর্ঘজীবন ও সুস্থ দেহলাভের প্রধান সহায়।

৪। ভাত মুখে দেওয়ার পূর্ব্বে সামান্য একটু জলপান করিয়া আহার করিবে।

৫। উদরপূর্ণ করিয়া আহার করা কিছুতেই উচিত নয়। উদরের অর্দ্ধেক খাদ্য দ্রব্যে, চারি আনা পানীয় জলে এবং বাকী চারি আনা বায়ুর ক্রিয়ার জন্য শূন্য রাখিবে।

৬। পুনঃ পুনঃ অল্পমাত্রায় আহার করিবে। অতিভোজন ও শূন্যোদর উভয়ই আয়ুঃক্ষয়কর।

৭। কখনও মেরুদণ্ড বক্র করিয়া বসিবে না।

৮। ঘৃতে ও দুগ্ধে কখনও লবণ ব্যবহার করিবে না।

৯। ভাতের সহিত অথবা আহারের পর কাঁচা ফল ও মূল ব্যবহার করা অতিশয় আয়ুর্বর্দ্ধক। ইহা দেহের হিতকারী, পিত্তাধিক্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের বড়ই উপকারী।

১০। একশ্বাসে যত জল পান করা যায়, তাহাই হিতকর।

১১। দুগ্ধের সঙ্গে ভাত অথবা অন্য খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পান করতঃ আহার করিবে, এই ভাবে দুগ্ধপানেই প্রকৃত উপকার পাওয়া যায়। দুধ চুমুক দিয়া খাইবে না।

১২। যাহার তাহার হাতে খাওয়া উচিত নয়, তাহাতে অপরের শারীরিক ও মানসিক দোষ গুণ স্বীয় শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে।

১৩। অপরের উচ্ছিষ্ট কখনও গ্রহণ করা উচিত নয়, নিজের উচ্ছিষ্টও কাহাকে দিবে না।

১৪। পরিশ্রমান্তে বিশ্রাম না করিয়া আহার বা জলপান করিবে না।

১৫। দিবা যামদ্বয়ের (১২টা) মধ্যে আহার করিবে ; রাত্রি ১২ ঘটিকার পর কিছুতেই আহার করিবে না।

১৬। পূর্ণ উদরে কখনও পথ চলা উচিত নয়।

১৭। অনিচ্ছাসত্ত্বে শত অনুরোধেও কখনও কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবে না।

১৮। 'খাইব কি না' এরূপ সন্দেহে আহার না করাই ভাল।

১৯। ধীরে ধীরে চিবাইয়া আহার করাই নিরাপদ, বিশেষ উদরাময়গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে।

২০। প্রত্যহই সাধ্যানুসারে দুগ্ধ বা দুগ্ধের অবস্থান্তর কিছু খাওয়া উচিত।

২১। প্রফুল্লচিত্তে মৌন হইয়া আহার করিবে।

২২। বিশুদ্ধ ঘৃতপক্ক জিনিষই পরম স্বাস্থ্যকর, তৈলপক্ক জিনিষ অনিষ্ট-কারক।

২৩। প্রস্তর নির্ম্মিত ভোজনপাত্র সব চেয়ে নিরাপদ।

২৪। আহারান্তে কিছুতেই কুল্লী করিয়া ঐ জল ফেলিবে না গিলিয়া ফেলিবে, কেন না আহারান্তে কুল্লী করিলে অতিরিক্ত লালা ক্ষয় হয়, কাজেই উহা ফেলিলে পরিপাক কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হয়।

২৫। আহারান্তে বিশ্রাম না করিয়া কখনও পথ চলিবে না। "খেয়ে পিয়ে না জিড়ায় (বিশ্রাম), তার পিছনে যম যায়।" এই চিরপ্রচলিত প্রবাদ বচন ধ্রুব সত্য ; কারণ উদরপূর্ণ অবস্থায় শ্বাসের গতি অতি প্রবল ও দ্রুতগামী হয়, তদবস্থায় পাদচারণা করিলে অল্লায়ু জীব মশকের ন্যায় পরমায়ু খর্ব্ব হইয়া যাইবে।

২৬। পরিপাক কার্য্য আরম্ভ না হইলে কথা বলা উচিত নয়।

২৭। আহারের পর সাধারণ সিংহাসনে বসিবে অর্থাৎ পাদদ্বয় নিতম্বের দুই পার্শ্বে রাখিয়া এবং পায়ের গোড়ালী চাপিয়া, জানুদ্বয় সংযোগ করতঃ মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিবে (এই নিয়ম ক্রমে অভ্যাস করিবে), গুহ্যদ্বার শূন্য না থাকে, এজন্য কোমল কোন জিনিস গুহ্যে দিয়া তৎপর শৃঙ্গ, হাড় কিম্বা গাটা-পার্চার চিরুণী (কখনও কাঠের চিরুণী ব্যবহার করিবে না) দ্বারা সমস্ত চুলের গোড়া আস্তে আস্তে ভালরূপ আচড়াইবে, ইহাতে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি নীরোগ ও সবল থাকে, বহু বাক্য ব্যয় করিলেও মাথা গরম হইবে না।

২৮। পাক করা জিনিস ঈষৎ উষ্ণ থাকিতেই আহার করা উচিত, বিলম্বে ও শীতল হইলে উহাতে কীট জন্মে।

২৯। মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রে আহার্য্য জিনিস পাক করিলেই তাহা প্রকৃত স্বাস্থ্যকর হয়।

৩০। শূন্য উদরে কখনও কাঁচা ফল খাওয়া উচিত নহে, কেন না শূন্য উদরে অম্লভাগ (এসিড) বেশী থাকে, উহাতে কাঁচা ফল খাইলে আচারের ন্যায় শক্ত হইয়া থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বোম্বাই আয়ুর্ব্বেদসমিতি।

বিগত ১৯শে এপ্রিল তারিখে বোম্বাই সহরে আয়ুর্ব্বেদ সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গেল। মান্দ্রাজের আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ডি, গোপাল চার্লু ঐ সভাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাতে প্রায় তিন শত কবিরাজ ও অন্যান্য বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় বক্তৃতায় বলেন যে, ইদানীং আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসাপ্রণালীর অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে। এই অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জনসাধারণের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি অনাস্থা বৃদ্ধি পায় নাই, কবিরাজদিগের সুশিক্ষার অভাবেই আয়ুর্ব্বেদের অবনতি হইয়াছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে দেশে স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, বোম্বাই প্রদেশে "মেডিকেল রেজিষ্ট্রেশন" বিধানের ফলে দেশের লোকের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং অসুবিধাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এক একটি তালুকে একজন করিয়া চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু সেই একজন চিকিৎসকের দ্বারা সহস্র সহস্র প্রজার অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। কবিরাজদিগকে উৎসাহ প্রদান এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য উপাধি প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। যদি গবর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত চিকিৎসা প্রণালীর বিলোপ ঘটিবে।" সভাপতি মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজ স্থাপন ও অন্তঃপুরচারিণীদিগের চিকিৎসার জন্য মেয়ে কবিরাজের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া উপসংহারে কবিরাজি চিকিৎসা বিষয়ক যাদুঘর প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রশ্ন।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের রীতিমত অধ্যয়ন অধ্যাপনা না থাকায় শাস্ত্রীয় অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইতেছে না। অধ্যাপক বা অধ্যয়নার্থীগণ অনেক স্থলে স্ব-কপোলকল্পিত অর্থ করিয়া কর্ত্তব্যের শেষ করেন; কিন্তু আমরা মনে করি, যে সকল স্থানে সাধারণের প্রশ্ন বা তর্ক উপস্থিত হয়, সে সকল বিষয়ে সার্ব্বভৌম মত স্থাপন হওয়া উচিত। এরূপ প্রশ্নোত্তর প্রকাশের জন্য আমরা প্রতি মাসেই আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশে কতক স্থান দান করিব। যাঁহার যেখানে যে প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তিনিই তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব এবং উত্তর দাতাগণ হইতে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাও যথাসময়ে প্রকাশ করা হইবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক গাছ গাছড়া ঔষধ অনেকে প্রকৃতরূপে চিনেন না। কেহ কেহ নিজ নিজ ধারণামত প্রকৃত ঔষধের পরিবর্ত্তে অন্য যা' তা' একটা প্রয়োগ করিয়া বসেন, ইহা যতদূর সম্ভব অনিষ্টজনক কার্য্য। যাহার যে স্থলে সন্দেহ থাকে, তাহার সে বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই কার্য্য করা উচিত; এই-রূপ একটির পরিবর্ত্তে অন্যটি প্রয়োগ করিয়া অনেকে তাহার খারাপ ফলও পাইয়া থাকেন। যিনি যে ঔষধের যথার্থ পরিচয় পাইয়া থাকেন, তিনি তাহার স্বরূপাদি সাধারণে আলোচনা করিলে লোকের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। আর যাহার কোন দ্রব্য সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তিনিও তাহা সকলের নিকট উপস্থিত করিলে সদুত্তর পাইতে পারেন। আমরা আশা করি সকলেই উক্ত প্রকার অসুবিধা দূর করিতে চেষ্টিত হইবেন।

আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষোন্নতি বিধানার্থ হরিদ্বারে "আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়" নামে এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ আয়ুর্ব্বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রোগীশুশ্রূষাপ্রণালী এবং ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য নাকি উত্তমরূপেই চলিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র একরূপ নাই বলিলেই চলে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবই

আয়ুর্ব্বেদের অধঃপতনের মূল। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাব দূর করিয়া সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন, তাঁহারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমরা ভরসা করি, দেশের স্থানে স্থানে এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইলে অচিরেই আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিবে।

---

* পুস্তক-পরিচয়।

আমরা শ্রীযুক্ত ললিতারমণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "পরমায়ু" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রারম্ভেই বলিতে পারি, পুস্তকখানিতে দেহরক্ষার ও স্বাস্থ্যোন্নতির সহজ সরল নিয়মগুলি একত্র সংগৃহীত হওয়ায় উহা প্রত্যেকেরই আদরণীয় হইবে। আহার, বিহার, ব্যায়াম, ঋতুচর্য্যা, নিদ্রা, পরিধেয় প্রভৃতি বিষয়ে ঋষি ও যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণের যে সকল অমূল্য উপদেশগুলি গ্রন্থকার তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকে একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও নির্ব্বাচন প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

গ্রন্থের 'সূচনায় ও 'পরিশিষ্টে' গ্রন্থকর্ত্তার অভিমতের সহিত আমাদের অনেক স্থলে মিল না থাকিলেও অধ্যায় বিভাগে যে সকল নিয়মাবলী উল্লিখিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে, আমরা তাহার প্রকান্ত পক্ষপাতী।

জ্ঞানই শক্তি। ইচ্ছাই শক্তি। জনসাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঐ সকল সহজ সরল নিয়মগুলি অবগত হইয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে যত্নসহকারে উহাদের প্রয়োগ করিলে ব্যক্তিগত জীবনের ও সমাজের বহু উন্নতি সাধিত হইবে। আমরা তাই, ঐসকল নিয়মাবলী হইতে সার সংগ্রহ করিয়া আমাদের পাঠক বর্গকে উপহার প্রদান করিব এবং যে স্থলে প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থের অনুমত

---

* এই পুস্তক পাইবার ঠিকানা — শ্রীললিতামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পোঃ কোরহাটি, গ্রাম ঝাউটিয়া, জিলা ঢাকা। অথবা আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ কার্য্যালয়, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

বা অনভিমত হইয়াছে আমরা ক্রমশঃ তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিব। অন্নাদিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। তাই আমরা প্রথমতঃ আহার সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিলাম।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, পুস্তিকাখানার এই মাত্র প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছে, ইহার স্থানে স্থানে ভাষা, ভাবও মুদ্রাকরের প্রমাদ রহিয়াছে। অধ্যায়ের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধেও কতকটা বিশৃঙ্খলতা রহিয়াছে। পুনর্মুদ্রণের সময় প্রকাশক মহোদয় এই সকল দোষের সংশোধন করিয়া দিলে পুস্তকখানা বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। আমরা এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করি। পুস্তকের মূল্য বার আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, লোকের সুবিধার জন্য সম্প্রতি আট আনা করা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশের নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদ বিকাশের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।০ আনা। নমুনার জন্যও ঐ মূল্য দিতে হয়।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়; এবং বৈশাখ হইতে পূর্ণ এক বৎসরের মূল্য গ্রহণ করা হয়। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা বৈশাখ হইতেই লইতে হইবে।

৩। পত্রিকা সম্বন্ধীয় চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, টাকা কড়ি ও আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য প্রশ্ন প্রভৃতি "কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ সম্পাদক, আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ কার্য্যালয়, পাটুয়াটুলী ঢাকা" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৪। কোন বিষয় উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে পত্র লিখিবার সময় সঙ্গে ডাকটিকেট প্রেরণ করিবেন।

৫। নাম ও ঠিকানা বেশ পরিষ্কার করিয়া লেখা উচিত। প্রবন্ধ ও পত্রাদি কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না।

বিজ্ঞাপনের হার।

কভারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা মাসিক	১০৲	ভিতরের একপৃষ্ঠা মাসিক	৫৲
" ৩য় " "	৮৲	" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা "	৩৲
" ৪র্থ " "	১২৲	" সিকি পৃষ্ঠা "	২৲

দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইলে তাহার দর স্বতন্ত্র চুক্তি করিয়া লওয়া হয়। বিশেষ জানিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ কার্য্যালয়,
পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত।

"প্রাণো বা অমৃতম্।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র।)

"আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥"

বাগ্‌ভট।

১ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ | দ্বিতীয় সংখ্যা।

দীর্ঘজীবন ও মনুষ্যত্ব লাভের বীজ।

স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘজীবন ও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে কয়েকটি পরম্পরা নিয়ম পালন প্রধানতঃ আবশ্যক। সেই নিয়মের প্রথমক্রম—তপস্যা বা ধ্যানযোগ অর্থাৎ মনস্থির করাই প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাদ্বারা শুভাশুভ কর্ত্তব্য নির্ণয় ও কর্ম্মে শক্তি লাভ হয়।

দ্বিতীয়ক্রম—অনর্গল আহার বিহারে কিঞ্চিৎ বিরতি বা সংযম, ইহার নাম উপবাস। ইহাদ্বারা দেহের জড়ভাব দূর হয়। নিরোগিতা উৎসাহ এবং পরিণামে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের বল বৃদ্ধি পায়। রোগ সমূহের ইহাই প্রথম চিকিৎসা।

তৃতীয়ক্রম—জাগতিক নিয়ম সকল অভ্যাস করিবার নিমিত্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। অধ্যয়ন অধ্যাপন দ্বারাই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা দেহ মন ও প্রাণের তৃপ্তি, স্বাস্থ্যোন্নতি ও দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। (অবশ্য অন্যান্য ক্রম দ্বারাও জীবনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে)।

চতুর্থক্রম—ব্রহ্মচর্য্য, ইহার অপর নাম বীর্য্যরক্ষা। পূর্ব্বোক্ত ক্রম সকল পালন করিয়া যে বীর্য্য বা উৎকর্ষ লাভ করা গেল, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই ইহার উদ্দেশ্য। ধ্যানযোগে যেই একাগ্রতাটুকু আয়ত্ত করিলে, উপবাস দ্বারা যেই সন্তোষটুকু সঞ্চয় করিলে, অধ্যয়ন দ্বারা যেই বিজ্ঞান সম্পদ বরণ করিয়াছিলে, সে সমুদয় যাহাতে তোমার বিন্দুমাত্রও ক্ষয় না হয় সে জন্যই এই চতুর্থ ক্রম ব্রহ্মচর্য্যবিধি। ইহাদ্বারা বিজ্ঞানের আলোকরেখা সতত প্রতিভাত হয়; ধর্ম্ম আসিয়া দুর্ভেদ্য বর্ম্মদ্বারা পাপাগ্নি হইতে দেহ পতঙ্গকে রক্ষা করে। বার্দ্ধক্য, রোগ, শোক, দুঃখ দৈন্য তাঁহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে। পাপ দুর্নীতি সকল দূর হইতে পলায়ন করে, জগৎ তাঁহার বশীভূত হয়।

পঞ্চমক্রম—ব্রতানুষ্ঠান বা সদাচারবিধি পালন। তুমি ধ্যানযোগ কর, তোমার মন শতস্থির হউক, উপবাস কর, চিত্ত তুষ্টি সাধিত হউক, অধ্যয়ন বা অধ্যাপন কর, জগতের জটিল তত্ত্ব সমুদয় তোমার সম্মুখে দর্পণের ন্যায় প্রতিভাত হউক, আর ব্রহ্মচর্য্যাই কর তোমার বীর্য্যোৎকর্ষ রক্ষিত হউক, কিন্তু তুমি ইহাদের সঙ্গে যদি একটিমাত্র বিধান পালন না কঁর তবে তোমার অভীষ্ট ক্ষেত্রে তুমি পৌঁছিতে পারিবে না। তোমার স্বর্গের সীড়ি মধ্যপথে ধ্বসিয়া যাইবে। তপস্যা দ্বারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলে, সাগর জলে তাহা ডুবিয়া যাইবে। উপবাস দ্বারা যেই অমৃতটুকু লাভ করিয়াছিলে, তাহা গরলে পরিণত হইবে। অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলে, তাহা উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় শুধু শূন্যে মিশাইয়া যাইবে, কেহই তাহা গ্রহণ করিবে না। ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা যে বীর্য্য-বিভব লাভ করিয়াছিলে, তাহা পশুবৃত্তির আচরণ করিবে। যদি তুমি সমুদয়ের ফল একত্র উপভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে সদাচার বিধি পালন করিতেই হইবে। সদাচারই তোমার সর্ব্বজ্ঞান ও কর্ম্ম মার্গের দীপ-শলাকা। সর্ব্ব সময়ের জন্যই ইহাকে জীবনের সঙ্গী করিতে হইবে।

তপস্যা করিয়া যদি তুমি পরস্ব অপহরণ কর, উপবাস করিয়া যদি তুমি কাম-ক্রোধের সেবাপরায়ণ হও, অধ্যয়ন করিতে করিতে যদি তোমার পরদারে অভিলায় হয়। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াও যদি তুমি জগতকে ভাল বাসিতে না শিখ, তবে তোমার কোন অভীষ্ট সাধন হইতে পারে না? এ জন্যই তোমার নীতি শিক্ষাকে সকলের সহ চারিণী করিয়া লইতেই হইবে। যেখানে নীতি ক্ষুণ্ণ হইবে, সেখানেই জানিবে তোমার সুখের সোপান টুটিয়া যাইতেছে, স্বর্গের দ্বারে কণ্টক জন্মিতেছে।

আর্য্য-ঋষিগণ এ সকল তত্ত্ব অতি বিশদভাবেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা—দীর্ঘজীবী—দূরদর্শী—জগৎ-হিতৈষী, মানুষ হইয়াও দেবতা, মর হইয়াও অমর।

আয়ুর্ব্বেদ রসায়ন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

আয়ুর্ব্বেদ রসায়ন সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় সাধারণের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে সমুদয় বিশেষরূপে জানা না থাকায় লোকের মনে নানারূপ সংশয় বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত আমরা প্রদর্শন করিব।

মকরধ্বজ, স্বর্ণসিন্দূর প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ রসায়নের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। এই মকরধ্বজ দ্রব্যটি যে বস্তুতঃ কি পদার্থ, ইহার মধ্যে কি গভীর রসায়ন বিজ্ঞান নিহিত আছে কোন্ শক্তিবলে ইহা যুগযুগান্তর যাবৎ সমভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে তাহা অনেকেই সম্যক্ অবগত নহেন। অনেকেই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মকরধ্বজ সম্বন্ধে নানামত স্থাপন করিয়া ইহার ব্যবসায় করিতেছে, লোক সকলও সেই সমুদয় অসার জিনিষ ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নাশ করিতেছে।

মকরধ্বজ দ্রব্যটি পারদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই পারদের বিশুদ্ধিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক যুক্তি তর্ক আছে। পারদ যে একটি ভয়ঙ্কর অপকারী জিনিষ, আর মকরধ্বজ যে একটি সর্ব্বরোগ নাশক সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ

ইহা অনেকেই অবগত আছেন। পারদ একটা দুষ্ট পদার্থ হইয়াও তাহাদ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত হইলে কেন এত কার্য্যকরী হয়, তাহা একটু অনুধাবনা করা বিশেষ দরকার।

পারদ একপ্রকার খনিজ পদার্থ। তাহার সহিত গন্ধক ও স্বর্ণ যুক্ত হইয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। সাধারণ পরীক্ষায় দেখা যায় মকরধ্বজে পারদ ব্যতীত গন্ধক বা স্বর্ণ সংযুক্ত ভাবে থাকে না, উহা শুধু পারদভস্ম বিশেষ।

প্রথম পারদ দ্রব্যটি কি, তাহা আলোচনা করিয়া পরে মকরধ্বজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

পারদ ধাতু গন্ধক প্রভৃতির সহযোগে অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পারদের দোষগুণ সম্বন্ধে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সকল চিকিৎসা শাস্ত্রেই উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কথাই আমরা এস্থানে উল্লেখ করিব। পারদের এই সকল দোষ উল্লেখিত আছে যথা—

নাগো বঙ্গো মলো বহ্নি শ্চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরিঃ।
অসহ্যাগ্নি র্মহাদোষা নিসর্গাঃ পারদে স্থিতাঃ॥
পর্পটী পাটলী ভেদী দ্রাবী মলকরী তথা।
অন্ধকরী তথা ধ্বাজ্ঞী বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তকঞ্চুকাঃ॥

অর্থাৎ স্বভাবতঃ পারদে নাগ, বঙ্গ, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্যাগ্নি দোষ ও আর পর্পটী প্রভৃতি সপ্ত কঞ্চুক দোষও বিদ্যমান থাকে। উপযুক্তরূপে পারদ বিশুদ্ধ না হইলে যে সকল অনিষ্ট হয় তাহা—

ব্রণং কুষ্ঠং তথাজাড্যং দাহং বীর্য্যস্য নাশনম্।
মরণং জড়তাং স্ফোটং কুর্ব্বন্ত্যেতে ক্রমান্নৃণাম্॥
তস্মাদ্রসস্য সংশুদ্ধিং বিদধ্যাদ্ভিষজাংবরঃ।
দোষহীনো যদা সূতস্তদা মৃত্যুজরাপহঃ
শুদ্ধোঽয়মমৃতঃ সাক্ষাদ্দোষযুক্তো রসোবিষম্॥

অবিশুদ্ধ পারদ শরীরস্থ হইলে নাগদোষ হইতে ব্রণ, বঙ্গ দোষ হইতে কুষ্ঠ, মলদোষ ও গিরিদোষ হইতে জড়তা, বহ্নি দোষ হইতে দাহ, চাঞ্চল্য দোষ হইতে বীর্য্যনাশ, বিষ দোষ হইতে মৃত্যু এবং অসহ্যাগ্নি দোষ হইতে স্ফোট রোগ উৎপন্ন

হইয়া থাকে। অতএব পারদের বিশেষ শুদ্ধি আবশ্যক। শোধিত পারদ অমৃত তুল্য এবং দোষযুক্ত পারদ বিষতুল্য অনিষ্টকর। পারদের দুই প্রকার শুদ্ধি দেখা যায়। এক প্রকার রোগাপনয়ন, অপর রসায়নার্থ। যে শুদ্ধি রোগ নাশের জন্য করা হয় তাহা রসায়নের উপযোগী নহে, কিন্তু রসায়নার্থ যে শুদ্ধির বিধান আছে তাহা রসায়ন এবং রোগ নাশ উভয়ের তুল্য উপযোগী। শাস্ত্র যথা—

যা শুদ্ধিঃ কথিতা ব্যাধৌ সনেষ্টা হি রসায়নে।
রসায়নেত্ব যা শুদ্ধিঃ সা ব্যাধাবপি কীর্ত্তিতা॥

বিশিষ্ট প্রকারে শুদ্ধ ও মারিত পারদের গুণ যথা—

পারদঃ কৃমি কুষ্ঠঘ্নঃ পারদো দৃষ্টিদঃ সরঃ।
মৃত্যুঘ্নশ্চ মহাবীর্য্যো যোগবাহী জরাহরঃ॥
স্মৃত্যোজো রূপদো বৃষ্যো বৃদ্ধিকৃদ্ধাতু বর্দ্ধনঃ।
ষণ্ডত্বনাশনঃ শূরঃ খেচরঃ সিদ্ধিদঃপরঃ॥
পারদঃ সকল রোগহাস্মৃতঃ ষড়্‌রসো নিখিল যোগবাহকঃ।
পঞ্চভূতময় এষ কীর্ত্তিত স্তেন তদ্‌গুণ গণৈ র্ব্বিরাজতে॥

পারদের প্রধান গুণ যথা—কৃমিনাশক, কুষ্ঠঘ্ন, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক, সারকগুণ বিশিষ্ট, মৃত্যুনাশক, মহাবীর্য্যবান্, যোগবাহী, জরানাশক, স্মৃতি, ওজঃ ও কান্তিপ্রদ, বৃষ্য, শরীরের পুষ্টি ও ধাতুবর্দ্ধক, ক্লৈব্যনাশক, শক্তিশালী, উৎপতন-শীল, অভিষ্টপ্রদ, সমস্তরোগনাশক, ষড়্‌রস বিশিষ্ট, সর্ব্বযোগ বাহী, এবং পঞ্চভূত ময় হেতু তদ্‌গুণ সম্পন্ন। ইহা অবশ্য স্থূলার্থ, ইহার প্রত্যেকটিগুণ বিশদ করিয়া লিখিলে একখানা গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমরা এখানে এই সকল গুণের একটি মাত্র গুণের সংক্ষেপ পরিচয় দিব।

শাস্ত্রকার বলিলেন পারদ যোগবাহী, ইহার তাৎপর্য্য কি? যোগসমূহকে যে বহন করে অর্থাৎ সহযোগী করিয়া লয়। এখানে যোগ বলিতে ভেষজ সমূহ বুঝিতে হইবে। ব্যাধি বিনাশে যাহা যুক্ত হয় তাহার নামই যোগ বা ভেষজ। পারদ সর্ব্ব যোগবাহী বলিয়াই সর্ব্বরোগ নাশক। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া সহজে বুঝাইতেছি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কয়কটি পদার্থই যোগবাহী যেমন ঘৃত, তৈল, জল, মধু, মস্ত, পারদ প্রভৃতি। এই সমুদয় দ্রব্যের স্বতন্ত্র বিশিষ্ট

কতগুলি গুণ আছে, পরন্তু ইহারা অন্য দ্রব্যের সহিত প্রক্রিয়া বিশেষে যুক্ত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় অভিনব গুণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে কথা এই, যে, কোন ঘৃত, তৈল, জল প্রভৃতিই যোগবাহী নহে, সময় সময় হয়তঃ যোগ ক্ষয় কারীও হয়। দূষিত জল সহযোগে কোন খাদ্য প্রস্তুত করিলে যেমন সেই খাদ্য দূষিত হইয়া থাকে এবং শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। ঘৃত তৈল পারদাদি সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

কোন যোগবাহী দ্রব্যে স্বেচ্ছামত কোন যোগের অনুরূপ গুণ গ্রহণ করাইতে হইলে মূল দ্রব্যটি বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যোগবাহী দ্রব্য মাত্রই যোগগ্রাহী করিবার পূর্ব্বে তাহা বিশুদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কি না দেখিতে হইবে। জল বা তৈলে স্ব স্ব অনেক গুণ আছে কিন্তু ইহারা ভেষজ পরিপাচিত হইয়া তত্তদ্ গুণ গ্রহন করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় পাচন (ক্বাথ) কল্ক তৈল, ঘৃত প্রভৃতি এই নিয়মেরই অন্তর্গত। এই সকল দ্রব্য নিজ গুণ পরিত্যাগ করেনা অথচ অন্য গুণ গ্রহণ করিয়া বীর্য্য শালী হয়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ও দেখা যায়, তাঁহারা এই নিয়মে বিশুদ্ধ মদ্য সহযোগে অধিকাংশ দ্রব্যের বীর্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাতে মদ্য নিজ শক্তি রক্ষা করিয়া ও অন্য ভেষজের গুণ সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। এই মদ্য যত বিশুদ্ধ হইবে ততই তাহার গুণ গ্রহণের ও তাহা স্থায়ী করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

কোন্ দ্রব্য কোন্ দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করিতে কতদূর সক্ষম তাহা অবশ্যই বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তিসাপেক্ষ। সকলে ইহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না, এজন্য রীতিমত শাস্ত্রাভ্যাস করিতে হয়।

পারদ কোন্ শ্রেণীর যোগবাহী দ্রব্য তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পারদ একটি খনিজ পদার্থ। বিবিধ ধাতুর সহিত অবস্থান করে। এই পদার্থের সঙ্গে খনিজ ধাতু দ্রব্যেরই মুখ্য সম্বন্ধ, উদ্ভিজ্জাদির সহিত সম্বন্ধ গৌণ। জল যেমন বিষের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিষাক্ত হয়, অমৃতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অমৃততুল্য হয়, সেই প্রকার পারদ ও দোষী ধাতুর সংস্পর্শে স্বভাবতঃ দুষ্ট থাকে, তাহাই বিশুদ্ধ বা দোষ বর্জ্জিত হইয়া উৎকৃষ্ট ধাতুর সহযোগে গুণোৎকর্ষ লাভ করে।

পারদ এই নিয়মে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর বা তদধিককাল খনি মধ্যে দূষী ধাত্বাদির সংমেলনে স্বভাবতঃ দূষিত অবস্থায় থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অবিশুদ্ধ পারদ যে অতি ভয়ঙ্কর পদার্থ, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে, যাহারা পারদের খনিতে অথবা দর্পণাদি প্রস্তুতের কারখানায় অবিশুদ্ধ পারদের সংস্রবে থাকে, তাহারা অনেকেই পারদ জনিত অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি সমূহে আক্রান্ত হয়। প্রথমতঃ তাহাদের স্নায়বিক রোগ সকল প্রকাশ পায়। যথা কম্প, পক্ষাঘাত, শিরোঘূর্ণন, স্মৃতিক্ষীণতা ইত্যাদি। তখন বিশেষ সতর্ক না হইলে ক্রমে প্রলাপ, মূর্চ্ছা (মৃগী), সন্ন্যাস প্রভৃতি উৎকট পীড়া প্রকাশ পায় এবং মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

প্রাকৃত অবস্থায় পারদে বহু দোষ থাকিলেও তন্মধ্যে একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে, যাহা অন্য কোন ঔষধে প্রায় দেখা যায় না। যে কোন দূষী বা নির্দ্দোষী পারদ হউক না কেন, ইহা উপদংশ বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিলে, অতি শীঘ্র আময়িক ভাব দূর করিয়া নিরাময় অবস্থার সূচনা করে, কিন্তু সময়ে তাহার স্ব-গত দোষগুলিও ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে। অনেক অজ্ঞ চিকিৎসক পারদের এই প্রত্যক্ষ গুণ উপলব্ধি করিয়া উপদংশ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করিয়া আশু ফল প্রদর্শন করায়, ইহার পরিণাম যে ভয়াবহ তাহা যাহারা পারদ সেবন করিয়াছে, তাহারা বুঝিতে পারিতেছে। পারদ সেবনের ফলে অনেকেই অকাল জরাগ্রস্ত হয় এবং শরীর নিত্য রোগ প্রবণ এবং বিবিধ কণ্ডু স্ফোটক পীড়কাদি দ্বারা সর্ব্বদা জর্জ্জরিত থাকে।

এই পারদের সর্ব্বপ্রকার দোষ নিরাকরণ করিতে পারে নাই বলিয়াই পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ইহা সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন না। যে সকল স্থানে প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে তাহাও সন্দিগ্ধ চিত্তে, অতি সাবধানে। তাহার কারণ, ইহার রোগ দূর করিবার যেমন শক্তি আছে, সেরূপ পরিণামে ভয়ের ও যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে, ইহা পরীক্ষাদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বরোগেই পারদের ব্যবস্থা দেন, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নেই পারদের দোষগুলি নিরাকরণ করিবার বহু উপায় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সমুদয় দোষ পরিশূন্য করিয়া লইতে পারিলে, পারদ যে সর্ব্বরোগ বিজয়ী তাহাতে কোন সংশয় নাই।

পারদের বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার নাম রসশাস্ত্র। এই শাস্ত্রের আলোচনার জন্য বহু মনীষিগণের মস্তিষ্ক পরিচালিত হইয়াছে। যে নিয়মে পারদ দোষী ধাতু সমূহের দোষগুণ গ্রহণ করিয়া থাকে, ঠিক্ সেই নিয়মেই বিশুদ্ধ গুণশালী ধাতুর গুণসকল ও গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা ও শাস্ত্রসম্মত। পারদ দোষী ধাতুর দোষগ্রহণে যেমন সমর্থ, ঠিক্ সেই নিয়মে কি গুণ গ্রহণ করিতে পারেনা? অবশ্যই পারে বলিতে হইবে। কিন্তু কথা এই, সংমিশ্রিত দোষ গুণ মানব শরীরে একান্ত হিতকর হইতে পারে না, আমরা চাই স্বাস্থ্যের জন্য, রোগাপনয়নের জন্য একান্ত হিতকর দ্রব্য, যাহা সর্ব্বকাল সুখাবহ হয়। রোগমাত্রই দুঃখ এবং তন্নিবৃত্তিই সুখ। এই সুখ প্রত্যাশায়ই ঔষধের আবশ্যকতা।

আমরা যখন দোষ কামনা করি না, তখন দ্রব্যের দোষ পরিহার করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য গুণ রক্ষা ও সমধিক গুণের সমাহার। তৃতীয়তঃ যথাযোগ্য ভাবে প্রয়োগ। এই নিয়মকে আয়ুর্ব্বেদে শোধন প্রক্রিয়া বলা হয়।

প্রথমতঃ বহু দোষ সংশ্লিষ্ট পারদকে অসন্দিগ্ধ রূপে বিশুদ্ধ করিতে হইবে। পরে দেখিতে হইবে তাহার নিজ কি কি গুণ আছে, অথবা অতঃপর কোন অধিক গুণ তাহাতে সমাবেশ করা যায় কি না? এই যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান বহু উন্নত স্তরে উঠিয়া পড়িয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণ পারদের দোষ নিবারণার্থ ষড়্‌গুণবলিজারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। ইহাকে ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির উপযোগী করিয়া লইতে হইবে, এইরূপ গবেষণা ও অধ্যবসায়ের ফলে স্বর্ণাদি বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণ ঘটাইয়া রোগ ও অবস্থা বিশেষের অমোঘ কার্য্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখন দেখা কর্ত্তব্য, স্বর্ণাদি ধাতু মিশ্রণের ফল কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পারদ যোগবাহী ও স্বর্ণাদি ধাতু সমূহের দোষ গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ। দুষ্ট ধাতুর সংসর্গে যখন পারদ দুষ্ট ছিল তখন লোকসমূহের বস্তুতই ভীতিপ্রদ ছিল। পরে বিজ্ঞান বলে দোষ পরিহৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব পদার্থে পরিণত হইল, এই দোষ পরিশূন্যতা ও গুণ সম্পত্তির সমাবেশই মকরধ্বজের শ্রেষ্ঠতা।

বিশুদ্ধ কতকটা জল অথবা সুরাতে এক বিন্দু ঔষধ প্রদান করিলে যেমন জল বা সুরাটুকু সেই ঔষধের গুণ গ্রহণ করিয়া কার্য্যকরী শক্তিলাভ করে, ঠিক সেই নিয়মেই পারদ যখন নির্দ্দোষ বিশুদ্ধ অবস্থায় আসে, তখন তাহাতে বিজ্ঞান সম্মত যে কোন যোগের সমাবেশ করা যায়, পারদ তখন তৎসহযোগে সমধিক বীর্য্যশালী এক নূতন পদার্থে পরিণত হয়।

সপ্তধাতুর মধ্যে স্বর্ণ একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাতু, তাহা বৈদিক যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য এমন কি নিতান্ত অশিক্ষিত অসভ্য জাতিদের মধ্যেও স্বর্ণের পরম আদর। ইহার উপকারিতা যে বহুপ্রকার তাহাও সর্ব্বসম্মত। ইহা শরীরে ধারণ করিলেও দেহ মনের প্রভূত উন্নতি হয়। শাস্ত্রে ইহার গুণ এই প্রকার বর্ণিত আছে—

"সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম্।
স্বাদু তিক্তঞ্চ তুবরং পাকে চ স্বাদুপিচ্ছিলম্॥
পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতি মতিপ্রদম্।
হৃদ্য মায়ুষ্করং কান্তি বাগ্বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ।
বিষদ্বয় ক্ষয়োন্মাদ ত্রিদোষ জ্বরশোষজিৎ॥"

মহাভারতে বশিষ্ঠ পরশুরামকে ইহার গুণ বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বরত্নানি নির্ম্মথ্য তেজোরাশি সমুত্থিতম্।
সুবর্ণ মেভ্যো বিপ্রেন্দ্র রত্নং পরমমুত্তমম্॥
এতস্মাৎ কারণাদ্দেব গন্ধর্ব্বোরগ রাক্ষসাঃ।
মনুষ্যাশ্চ পিশাচাশ্চ প্রযতা ধারয়ন্তি তৎ॥
তস্মাৎ সর্ব্ব পবিত্রেভ্যঃ পবিত্রং পরমং স্মৃতম্।"

এই স্বর্ণধাতু শরীরে ধারণের জন্য তাহার তেমন শোধনের আবশ্যক না থাকিলেও ঔষধার্থ সেবনের জন্য ইহারও বিশেষ শোধন ও মারণ আবশ্যক। যথা নিয়মে স্বর্ণ বিশোধিত হইয়া অনুরূপ বিশুদ্ধ পারদের সহযোগে কেন পারদের গুণ বৃদ্ধি করিবে না? যদি আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, তবে বলিতে হইবে পারদের স্বর্ণাদি ধাতুর শক্তি গ্রহণ রীতি নিশ্চয় সুসিদ্ধ হইয়াছে। বনৌষধি সকল যখন ঘৃত তৈল জলসহ যথারীতি পাক হইয়া বিশিষ্ট গুণ লাভ করে, তখন সেই নিয়মেই পারদও স্বর্ণ সহযোগে বিশিষ্ট গুণ ধারণ করিতে পারে, ইহাও

স্বতঃ সিদ্ধ। এইরূপ স্বর্ণ ও পারদের বৈজ্ঞানিক বিশিষ্ট সংমিশ্রণে যে এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম, স্বর্ণসিন্দূর, মকরধ্বজ প্রভৃতি।

সম্প্রতি কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মকরধ্বজ প্রস্তুতে স্বর্ণের আবশ্যকতা নাই! কাহারও মত আবশ্যকতা আছে, কিন্তু তাহারা বলেন, স্বর্ণ পারদে সংশ্লিষ্ট হয় না বা স্বর্ণের কোন গুণেরও ব্যত্যয় হয় না, অথচ মকরধ্বজ সম্পূর্ণ স্বর্ণ গুণান্বিত হয়। একপক্ষ বলেন, স্বর্ণ যদি না মিশ্রিত হইল বা স্বর্ণের কোন ব্যত্যয়ই না হইল তবে স্বর্ণ দেওয়ার প্রয়োজন কি, বৃথা শ্রম ও অর্থব্যয় মাত্র। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন স্বর্ণদ্বারা মকরধ্বজ সহজে প্রস্তুত হয় এজন্যই ইহা দিতে হয়। বস্তুতঃ এ সমুদয় অতিপ্রাকৃত কথা। লোক সকল প্রকৃত শাস্ত্রোন্মুখী না হওয়াতেই এই সকল বিসদৃশ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে শুদ্ধ ব্যবসায় বুদ্ধির সংস্কার করিয়া মকরধ্বজে স্বর্ণের দোহাই দেন। প্রকৃতপক্ষে মকরধ্বজে স্বর্ণের আবশ্যকতা অনেকেই যেন হৃদয়ে স্থান দেন না।

ঘৃত তৈলাদিতে যে সকল বনৌষধি দ্রব্য প্রদত্ত হয় সেই সমস্ত দ্রব্য কি তৈলাদি পাকের পরও নিজগুণসহ অবিকৃত থাকে বা তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ কার্য্য চলিতে পারে? স্বর্ণ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ঘৃত তৈলাদিতে যেমন কোন দ্রব্য স্পর্শ মাত্র করাইলেই তাহাতে সম্যক্ গুণ গৃহীত হইতে পারে না। পারদেও স্বর্ণ স্পর্শ করাইলেই তাহার গুণ গৃহীত হইবে না। এক বাটী দুগ্ধ গ্রামবাসী সকলের জিহ্বা স্পর্শ করিয়াই যদি সকলের পুষ্টির কারণ হইতে পারে, তবে এক ভরি স্বর্ণদ্বারাও সমস্ত কবিরাজের মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া যাবতীয় লোকের জরাব্যাধি বিনষ্ট হইতে পারিত। আজ কাল অনেকেই প্রায় এই নিয়মে কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। ইহা নববিজ্ঞানের অনুপাত হইলেও আয়ুর্ব্বেদ সম্মত নহে।

কোন দ্রব্য জলের সঙ্গে অর্দ্ধঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলেই সমুদয় সার নিষ্কাষিত হয়। আবার কোন জিনিষ দুই ঘণ্টা তীব্রজ্বালে সিদ্ধ করিলেও সমস্ত সারভাগ বাহির হয় না। স্বর্ণের সঙ্গে কতকাল কি ভাবে অবস্থান করিলে পারদ স্বর্ণ গুণ সমন্বিত হয় তাহাই বিশেষভাবে বিচার্য্য।

পারদ যেমন কোটি কোটি বৎসর দোষীধাতুর সংমিশ্রণে দুষ্ট হইয়া থাকে, সেই-রূপ অভীষ্ট ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ধাতুর সহিত তাহার দীর্ঘকাল সংমিলন দোষাবহ

নহে। বিশুদ্ধ পারদে বিশুদ্ধ স্বর্ণ যতটা সম্ভব দীর্ঘকাল রাখিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে গন্ধকাদির সহকারিতায় তাহাকে সংমিশ্রণের সহায় করিয়া লইতে হইবে। এই নিয়মে বহুকাল রাখিয়াও এক প্রকার কায চলিতে পারে, তবে অধিকতর উচ্চ বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া অগ্নির সাহায্যে বহুবৎসরের কায অল্পসময়ে সম্পন্ন করিয়া লওয়া হইবে, সে জন্যই ইহাদের অগ্নির সাহায্যে পরস্পর গুণাকর্ষণের উপায় করিতে হয়। ইহাকে যন্ত্র পাক বলে। এই পাকের তারতম্য বহুপ্রকার হইতে পারে। পারদকে কেবল রূপান্তরিত করাই আমরা পাক বলিয়া গণ্য করি না। যদি তাহাই হয়, তবে হিঙ্গুল রসসিন্দুর মকরধ্বজ স্বর্ণসিন্দুর প্রভৃতি একই জিনিষ একই গুণ বিশিষ্ট হইত, কিন্তু এই সকল দ্রব্য এক জাতীয় হইয়াও পরস্পর যে, অনেক বৈষম্য ভাবাপন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সকলে ইহা বিশেষ স্মরণ রাখিবেন, পারদের বিশুদ্ধি ও স্বর্ণগ্রাসিতার উপর মকরধ্বজের শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করে। নতুবা শত স্বর্ণ দিলেও পারদ মকরধ্বজ না হইয়া "মরণধ্বজ" হইবে, রসায়ন না হইয়া বিষায়ন হইবে। মকরধ্বজে পারদ মুখ্য, স্বর্ণ গৌণ যথারীতি রসায়নোপযোগী শুদ্ধি না করিতে পারিলে, স্বর্ণই দেও আর যাহাই দেও, উহা "বিষসংসর্গাৎমৃতোহপি মৃতায়তে" হইবে। স্বর্ণ ব্যতীত যে রসসিন্দুর প্রস্তুত হয় তাহাও বিশুদ্ধিতার গুণে মকরধ্বজ হইতে নিতান্ত কম গুণশালী নহে। পারদের বিশুদ্ধির কথা আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

স্নেহ দ্রব্যের উপকারিতা।

(ঘৃত)

আমাদের জীবনের দৈনন্দিন পুষ্টিপ্রদ আহার্য্যের মধ্যে ঘৃত তৈলাদিই প্রধান, সুতরাং আজ এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্নেহ শিখ না—যাহা শরীরকে স্নিগ্ধ করে তাহার নাম স্নেহ। দুগ্ধ দধি প্রভৃতিকেও এই নিয়মে স্নেহ বলা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে স্নেহের ভাগ অল্প, সুতরাং ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা এই চারটিকেই প্রধানতঃ স্নেহ বলা হইয়া থাকে।

এই কয়েকটিতে স্নেহেরও খুব আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। চরক বোধ হয় এই অভি-প্রায়েই বলিয়াছেন ."সর্পিস্তৈলং বসা মজ্জা সর্ব্বস্নেহোত্তমা মতা" আমাদের দেশে, এই ঘৃত ও তৈলাদির উপকারিতার দরুণ লোকে প্রতিদিন ইহা আহারা-দির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে।

ঘৃত ও তৈলাদি যে শরীরের পক্ষে বস্তুতঃই নিতান্ত কল্যাণপ্রদ, তাহা আমরা ব্যবহারে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। ভারতের স্বাস্থ্য বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থাদি হইতেও সে বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই। প্রথমতঃ ঘৃত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। ঘৃত অতি সুস্বাদু, ইহা ব্যবহারে স্মৃতি, বুদ্ধি, শুক্র ও ওজঃ শক্তি বৃদ্ধি হয়, বায়ু ও পিত্ত প্রশমন করিয়া ইহা শরীরের সৌকুমার্য্য ও পুষ্টি সম্পাদন করে। অগ্নিমান্দ্য, বিষজ প্রাণীর দংশনাদি জন্য বিষ, উন্মাদ, অপস্মার, শ্রীহীনতা, যক্ষ্মা, অকাল পলিত ও বার্দ্ধক্য বিদূরিত করে। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে অভিনব কান্তি, তেজঃ বা লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ইহা শীত বীর্য্য, অর্থাৎ শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরকে উষ্ণ করে না! আরও কত কত শক্তি এই ঘৃতের অভ্যন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা মহর্ষিবৃন্দ যে, ইহাকে "সহস্রবীর্য্যং" এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহাদ্বারাই বেশ বুঝা যায়।

ঘৃতের গুণ সম্পর্কে, মহর্ষি চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট, ভাবপ্রকাশকার, যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ঔষধ দ্রব্য ও আহারের মধ্যে ঘৃতের স্থান অতি উচ্চে। ঘৃত পিত্ত বিকারে অতিমাত্র প্রশস্ত। শরীরের দাহাদি প্রশমনে অদ্বিতীয়। ঘৃত শরীরকে স্নিগ্ধ ও কোমল করে, ইহা কণ্ঠস্বরের মধুরতা ও বর্ণের প্রসন্নতা জন্মায়, আয়ু বৃদ্ধি করে, চক্ষুর হিতকর, শরীরের স্থৈর্য্যকারক, কফ ও মেদবর্দ্ধক, পরম পবিত্র, বলকারী ও রুচিপ্রদ। এক কথায় উহা শ্রেষ্ঠ, রসায়ন। এই ঘৃত সংস্কার বশে অতিরিক্ত অন্য গুণ ও ধারণ করে বলিয়া মেদকফেরও বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। ঘৃত এমন পবিত্র যে, কাহারও সঙ্গে সে বিরোধ করিতে জানে না। সে তাহার নিজের গুণত ধারণ করিয়া থাকেই, তা'ছাড়া যাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইবে তাহার গুণকেও নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া লইবে। উদাহরণ স্বরূপ একটী কথা বলি, ঘৃতে স্নেহ ও শৈত্যগুণ বিদ্যমান থাকায় কফ ও মেদবৃদ্ধি করে। কেন

না, ঘৃতের মত কফেরও স্নিগ্ধ ও শীতল গুণ। যে যেই গুণ যুক্ত ; সে সেই গুণের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা তর্কশাস্ত্রের একটা সাধারণ নিয়ম। আয়ুর্ব্বেদও বলেন "সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্।" কিন্তু ঘৃত যদি শুণ্ঠী অথবা চিত্রকাদি দ্বারা যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তবে সে ঘৃত চিত্রক অথবা শুণ্ঠীর রূক্ষ ও উষ্ণ গুণকেও ধারণ করিবে, আবার নিজের স্নিগ্ধ ও শৈত্য গুণকেও পরিত্যাগ করিবেনা। ইহা দ্বারা ফল এই হইবে, ঘৃতের স্নিগ্ধ শীত গুণও রহিল, আর রূক্ষও উষ্ণ গুণেরও অসদ্ভাব হইল না। এখন এই রূক্ষ ও উষ্ণ গুণ দ্বারা সে কফ এবং মেদকেও বিনাশ করিতে সমর্থ হইল।

কেহ কেহ এইস্থলে প্রশ্ন করেন, একটী ঘৃতে দুইটী বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ কিপ্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? এইস্থলে আয়ুর্ব্বেদ যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, শুণ্ঠী এবং চিত্রকাদি উষ্ণ বস্তুর সহযোগে যেস্থলে ঘৃতের পাক হইল, সেখানে ঘৃতের মধ্যে ঘৃতের শৈত্য ও স্নিগ্ধ গুণত থাকিবেই, কিন্তু তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট চিত্রকাদির গুণও সূক্ষ্মাবয়বে থাকিবে। এই জন্যই এক প্রকার সমস্ত ব্যাধির ঔষধরূপে ঘৃতের ব্যবহার পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে সুতরাং দেখা গেল, ঘৃত সর্ব্বপ্রকারে জীবদেহের উপকারক। ঘৃতের যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইল, নূতন ঘৃতেই প্রায় ঐ সকল গুণ দেখা যায়। গোদুগ্ধ জাত ঘৃতই সমস্ত ঘৃত হইতে শ্রেষ্ঠ গুণপ্রদ, এজন্য ঔষধ ও পথ্যাদিতে অধিক পরিমাণে গোঘৃতের ব্যবহার।

পুরাতন ঘৃতের গুণ ও কম নহে, রোগ বিশেষে, ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ, মত্ততা, অপস্মার, মূর্চ্ছা, শোথ, উন্মাদ, কুকুর প্রভৃতির দংশন জনিত বিষ, জ্বর, যোনি, কর্ণ ও শিরোবেদনাতে ইহা সুফল প্রদান করিয়া থাকে। পুরাতন ঘৃতের আর একটু বিশেষ গুণ এই যে, ইহা, সারক, বিপাকে কটুগুণ, ত্রিদোষনাশক, কুষ্ঠ, পীনস, কাস, শ্বাস এবং কফজনিত ফুসফুসের বেদনা নষ্ট করে। মস্তিষ্কের বিকার এবং বাতব্যাধির প্রকোপ বিদূরিত করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বরফাদির পরিবর্ত্তে সর্ব্বদাই পুরাতন ঘৃত ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অন্য বিবিধ স্নেহ অপেক্ষা, পুরাতন ঘৃত মস্তিষ্কের বিকার ও উষ্মা নষ্ট করিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। পুরাতন ঘৃত প্রায়ই বাহ্যিক মালিশাদিতে সমধিক ফল

পাওয়া যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত রোগসমূহে আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত ঘৃতের উল্লেখ আছে, তাহাতেও পুরাতন ঘৃত ব্যবহার্য্য; দশবৎসর হইলেই ঘৃত পুরাতন বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ইহার অতিরিক্ত হইলেত কথাই নাই, তবে ঘৃতের সারভাগ যেখানে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেখানে সে ঘৃত তত কার্য্যকরী হয় না। পুরাণ ঘৃতের গন্ধ উগ্র এবং রং মধু বা লাক্ষারসের মত একটু লাল হইবে। দশবর্ষের বেশী হইলেই তাহাকে অতি পুরাণ বলে।

ঘৃতের বিবিধ রোগবিনাশক, এবং দেহ শোধনের শক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের সাধকগণ বিবিধ ঔষধ দ্রব্যের সহযোগে পাক করিয়া বিবিধ রোগে এই ঘৃতের ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। ঘৃত আয়ুর্ব্বেদের একটি পরম রসায়ন ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আয়ুর্ব্বেদের আদর্শে ঘৃত ও তৈলাদির কোন ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালী নাই। ভারতের বাহিরে এই প্রকার থাকাও সম্ভব নহে। তবে হয়ত এমন দিন আসিবে, যখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ মকরধ্বজ, অশ্বগন্ধা, বাসক, নিম, জৈন, সপ, কুটজ, সজনা, অর্জ্জুন, অশোক প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধের মত, ঘৃতকেও আদরের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন। ভারতবাসীর শীর্ণ দেহে, আহার যেমন পেটভরা চাই, ঔষধ ও তেমনি পেটভরা দরকার, তজ্জন্য বোধহয় আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ, পাচনের ব্যবস্থা, দুগ্ধসহ ঘৃতের ব্যবস্থা এবং অনুপান সহযোগে বটিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গব্যঘৃত ব্যতিরেকেও মহিষাদি ঘৃতের ব্যবহার আছে, মহিষের ঘৃত অত্যন্ত শীতল, স্বাদে মধুর গুণ বিশিষ্ট, ইহা বিশেষ প্রকারে রক্ত পিত্ত নষ্ট করে। মস্তিষ্কের উষ্ণতায় ইহা বেশ ফলপ্রদ। ইহা অত্যন্ত শীতল বলিয়া কফকারক ও গুরু বটে কিন্তু শুক্রবর্দ্ধক। আজ কাল ইহা অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় বলিয়া খাদ্যরূপে ইহার খুব ব্যবহার চলিতেছে তবে গব্যঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক হীন।

মেষের ঘৃত, খুব শীঘ্র শীঘ্র পরিপাক করা যায়। ইহা অগ্নিদীপক, অস্থি বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর। ইহা অশ্মরী, শর্করা ও বাতরোগ নষ্ট করে। এই ঘৃত শ্বিত্র প্রভৃতি রোগে বিভিন্ন ঔষধ সহযোগে প্রলেপে ব্যবহার করিয়া আমরা বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। উর্দ্ধশ্লেষ্মজনিত জিহ্বাদি ক্ষতেও ইহা ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়।

ছাগঘৃতের গুণ অগ্নিবর্দ্ধক, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা রোগে এবং চক্ষুরোগে হিতকর, বল ও পুষ্টি সম্পাদক, এবং বিপাকে কটুগুণ বশতঃ কফ নাশক হইয়া থাকে। ছাগঘৃত প্রধানতঃ যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেই সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'অজাপঞ্চক' প্রভৃতি ঘৃতই তাহার প্রমাণ।

উষ্ট্র ঘৃত এদেশে দুর্ল্লভ, ব্যবহারও প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু ইহা শোষ ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিনাশে সমর্থ।

নারীদুগ্ধে যে ঘৃত হয় তাহা অমৃতোপম অর্থাৎ অমৃতের তুল্য উপকারী, ইহাও চক্ষুর হিতকর, রুচিজনক যোনিব্যাপৎ রক্তদুষ্টি ও পিত্ত বিকারে উপকারী। এই ঘৃত দুষ্প্রাপ্য সুতরাং ব্যবহার নাই।

অশ্বঘৃতেরও ব্যবহার নাই। ইহা লঘুপাক, দেহ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক, তৃপ্তিকর এবং বিষদোষ নাশক।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত।

বসন্তরোগ ও তাহার প্রতিকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আয়ুর্ব্বেদে বসন্ত রোগের কারণ ও লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—অতিরিক্ত কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষারদ্রব্য আহার, সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন, পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন, দূষিত খাদ্য, শিম ও শাকাদি আহার, বিষাদি দ্বারা দুষ্ট বায়ু ও জল সেবন, দেশের প্রতি ক্রূর গ্রহগণের দৃষ্টি, এই সমুদয় কারণে শরীরস্থ বাতাদি দোষ প্রকুপিত ও দুষ্টরক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূর কলায়ের মত যে সকল পীড়কা উৎপন্ন করে, তাহার নাম মসূরিকা। রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে জ্বর, কণ্ডূ, গাত্রবেদনা চিত্তচাঞ্চল্য, ভ্রম, চর্ম্মের স্ফিতি ও বিবর্ণতা এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে। শরীর বেদনা ও জ্বরই ইহার বিশেষ পূর্ব্বলক্ষণ। সাধারণতঃ জ্বর হওয়ার তৃতীয় বা চতুর্থ দিনের মধ্যেই বসন্তের গুটি গুলি প্রকাশ হয়। কদাচিৎ জ্বর না হইয়া অথবা জ্বরের সপ্তম কি অষ্টম দিনেও গুটি উঠিতে পারে এরূপ দেখা গিয়াছে।

জ্বরের তীব্রতা, শরীর বেদনা অস্থিরতা প্রভৃতি বাতের লক্ষণ ; দাহ, মূর্চ্ছা, প্রলাপ প্রভৃতি পিত্তের লক্ষণ ও কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি কফের লক্ষণের আধিক্য বা অল্পতা দেখিয়াই রোগ কঠিন বা সহজ দাঁড়াইবে তাহা বুঝা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে রোগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করিলেও মোটামুটি এই কয়টি বিভাগ করিয়া ইহার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা যাইতে পারে। প্রথম মসূরিকা জাতি যে সকল গুটি রক্তবর্ণ ও মসূর কলায়ের মত ক্ষুদ্র, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উঠে, এবং উপদ্রব কম থাকে, তাহার নাম মসূরিকা এই জাতীয় রোগে গুটি গুলি বেশ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর কমিয়া যায়। ক্রমে গুটি গুলি পাকিয়া উঠে ও শুষ্ক হইয়া আবরণসহ আস্ত মসূরকলায়ের ন্যায় চটা খসিয়া পড়ে। এই রোগ রীতিমত চিকিৎসা হইলে প্রায়ই জীবনের আশঙ্কা থাকে না। এই ব্যাধি রক্তগত। রক্ত দুষ্টির আধিক্য থাকিলে কখন কখন কঠিন হয়।

দ্বিতীয় চর্ম্মদল বসন্ত—ইহা অতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এই বসন্তগুটির বর্ণ নীল বা কৃষ্ণ, গুটি গুলি চিড়ার মত চেপ্টা, মধ্য ভাগ গর্ত্তের ন্যায় নিম্ন, ইহাতে অসহ্য বেদনা ও সর্ব্বদা জ্বর থাকে। গুটি গুলি সহজে পাকে না। শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, স্বরভঙ্গ হইয়া যায়, প্রলাপ মূর্চ্ছা প্রভৃতি বহু উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। এই রোগের আরম্ভ হইতে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে প্রায় রোগীই আরোগ্য হয় না। ইহা সান্নিপাত বা ত্রিদোষজ বসন্ত।

তৃতীয় জলবসন্ত—ইহাকে পানি বসন্তও বলে। শাস্ত্রে ইহাকে রসগত মসূরিকা বলা হইয়াছে। এই রোগ হওয়ার পূর্ব্বে সামান্য জ্বর হয় এবং জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় জল সহ গুটি উঠিতে থাকে। গুটি গুলি বেশ ভাসিয়া উঠিলেই জ্বর কমিয়া যায়। প্রথম যখন গুটি গুলি দেখা যায় তখন উহা অনেকটা রক্তগত মসূরিকা বলিয়াই বোধহয় পরে অল্প সময়ের মধ্যেই ফোস্কার মত ভিতরে জল দেখাদেয়। তিন চারি দিনের মধ্যেই গুটি গুলি পাকিয়া ভিতরে পূয হয়। ঘা'গুলি কখনও বিলম্বে কখনও বা শীঘ্র শুকাইয়া উঠে। এই রোগ প্রায়ই মারাত্মক হয় না। ইহার তেমন চিকিৎসারও আবশ্যক হয় না।

চতুর্থ ক্ষুদ্রজাতি. এই জাতীয় বসন্ত আবার অতিভয়ানক। প্রথম সমস্ত শরীরে ঘামাচির মত প্রকাশ পায়। যাহারা এবিষয়ে অনভিজ্ঞ তাহারা মনে করে ইহা লুস্তি বা হাম। অনেক সময় ভাল চিকিৎসকেরও প্রথম এই রোগ ঠিক

করিয়া উঠা কঠিন হয়। এই রোগে প্রথম জ্বর, গাত্রবেদনা প্রভৃতি বসন্তের লক্ষণ গুলি খুব তীব্রভাবে উপস্থিত হয়। দুই তিন দিনের মধ্যেই কুক্কুরীর মত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, লাগা লাগা গুটি উঠে ও চর্ম্ম গুলি অতি পুরু হয়। রোগীর কখনও শীত, কখনও দাহ, পিপাসা, প্রলাপ, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা প্রভৃতি সন্নিপাত জ্বরের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হয়। কাহারো কাহারো কাস, শ্বাস, অতিসার অথবা মলবদ্ধতা প্রভৃতি দুর্লক্ষণ সকল ও উপস্থিত হইতে পারে। এই জাতীয় বসন্ত অস্থিমজ্জাগত হইয়া উৎপন্ন হয়, ইহাও দুঃসাধ্য।

আর একপ্রকার বসন্ত আছে, চলিত কথায় তাহার নাম লুস্তি; হাম, ফেরা প্রভৃতি। শাস্ত্রোক্ত নাম রোমান্তী। এই রোগকে কেহ কেহ বসন্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ ইহাও একপ্রকার বসন্ত। এই রোগ শিশুদের অধিক হয়। এই রোগে প্রধানতঃ কফ ও পিত্তের প্রাধান্য থাকে। জ্বর, কাস, পেটের পীড়া প্রভৃতি ইহার প্রধান উপদ্রব। পীড়কাগুলি রোমকূপের মত সামান্য উচু, রক্তবর্ণ ও অতি ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। কফ, জ্বর ও পেটের পীড়া প্রভৃতি উপদ্রবের আধিক্য না থাকিলে এই রোগ বিনা চিকিৎসায়ও আরোগ্য হয়। এই রোগে বিকার অবস্থা ঘটিলে বা ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হইলে আরোগ্য হওয়া কঠিন। কখন কখন হাম উঠিয়া না পাকিতেই মিলাইয়া যায়। জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবের সঙ্গে এই অবস্থা দাঁড়াইলে, রোগ বিশেষ শক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। হাম উঠার পর রোগীকে রুক্ষ ভাবে রাখিলে প্রায়ই এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তখন হাম যাহাতে প্রকাশ হয় সেজন্য ঠাণ্ডা ঔষধ ও পথ্যাদি দিতে হয়। অন্যান্য জাতীয় বসন্ত ও এরূপ বসিয়া গিয়া মারাত্মক হয়।

সকল প্রকার বসন্তকেই সাধারণ লোকে ও একশ্রেণীর পাড়াগেঁয়ে চিকিৎসক শীতলা বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে ঠাণ্ডা ঔষধ ও পথ্য ভিন্ন অন্যরূপ চিকিৎসা বা পথ্য ইহার পক্ষে ভয়ঙ্কর অনিষ্টকারী। আমরা এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না।

আয়ুর্ব্বেদে অন্যান্য বসন্তের উল্লেখ করিয়াও শীতলা নামে স্বতন্ত্র একজাতীয় বসন্তের উল্লেখ আছে। এই রোগেও প্রথম জ্বর হইয়া একসপ্তাহ পরে গুটিসকল বাহির হয়, ক্রমে সাতদিন পর্য্যন্ত বাড়িয়া বড় বড় স্ফোটকে পরিণত হয়। তৃতীয় সপ্তাহে গুটিগুলি পাকিয়া শুষ্ক হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে শুধু

এই রোগেই ঠাণ্ডা ব্যবহারের নিয়ম পালনের ব্যবস্থা দেখা যায়। জ্বর থাকিলেও ঠাণ্ডা জল ও ঠাণ্ডা পথ্যাদি দিতে হইবে।

শীতলা রোগ শাস্ত্রে সাত প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরে বলা হইবে।

এখন বসন্তরোগের চিকিৎসা ও পথ্যাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। বসন্ত রোগীর ভালরকম শুশ্রূষা ও পথ্যাদির নিয়ম পালনই বিশেষ চিকিৎসা। এই রোগে বিশেষ ঔষধাদি না দেওয়াই অনেকের মত। ডাক্তার কবিরাজ অপেক্ষা টিকাদার, আচার্য্য প্রভৃতি লোকেই বসন্তের চিকিৎসা অধিক করিয়া থাকে। তাহারা কখনও মন্ত্রদ্বারা ঝাড়িয়া থাকে, কখনও 'টোট্‌কা' মুষ্টিযোগ প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইহাদের চিকিৎসার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রকমের দেখা যায়। একশ্রেণীর চিকিৎসক শুধু ঠাণ্ডা চিকিৎসারই পক্ষপাতী। তাহারা রোগীকে প্রায় সকল অবস্থায়ই স্নান এবং শীতল বস্তু পথ্য দিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদের মতে আমরা এইরূপ চিকিৎসার সর্ব্বথা সমর্থন করিতে পারি না। কোন কোন চিকিৎসক অবস্থা বিশেষে উষ্ণ বা শীতল ভাবে রোগীর ঔষধ পথ্যাদি নির্দ্দেশ করেন, বস্তুতঃ এই শ্রেণীর চিকিৎসাই প্রকৃত চিকিৎসা।

প্রথমতঃ যখন দেখিবে রোগীর জ্বর হইয়াছে এবং বসন্ত হওয়ার লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে বা সামান্য বসন্তের গুটি দেখা দিয়াছে, তখনই রোগীর অবস্থার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম দেখিবে জ্বরের ও উপদ্রবের অবস্থা, পরে দেখিবে গুটিগুলি কোন্ জাতীয়—হাম, জল বসন্ত, আসল বসন্ত অথবা শীতলা জাতীয় কি না।

জ্বর না হইয়া প্রায় কোন প্রকার বসন্তই হয় না। যদি লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে, রোগীর হাম, জল বসন্ত বা আসল বসন্ত হইতে পারে, তখন হইতেই শরীরে জল উত্তাপ ও বায়ু না লাগে প্রথম সেজন্য সতর্ক হইবে। নির্ম্মল বায়ুযুক্ত অতি উষ্ণও না হয়, অধিক শীতলও না হয় এমন গৃহে রোগীকে রাখিবে। ঘর্ম্ম না হয় সেজন্যও দৃষ্টি রাখিবে। গাত্রে সিদ্ধিপত্র চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

রোগীর জ্বর বৃদ্ধি না হইতে পারে, গাত্রে গুটির সংখ্যা যত কম হয়, এবং অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত না হয়, সেজন্যই বিশেষ সতর্ক হইবে। এই রোগে

প্রধানতঃ পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকে, সুতরাং পিত্তশ্লেষ্মনাশক ঔষধ ও পথ্য হিতকর। নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগগুলি ও প্রয়োগ করা যায়।

১। রোগের প্রারম্ভে শ্বেতচন্দনের কল্ক (জল দ্বারা ঘষা চন্দন) হেলেঞ্চা শাকের রস সহ অথবা কেবল হেলেঞ্চার রস পান করিলেও বসন্তরোগে উপকার হয়।

২। করলা পাতার রসে কাঁচা হরিদ্রার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রোমান্তী (হাম), জ্বর, বিস্ফোট ও মসূরিকা প্রশমিত হয়।

৩। প্রথম মসূরী দেখা দিলে, কুমারিয়া মূলের কাথে কিঞ্চিৎ হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উপকার পাওয়া যায়।

৪। বাসি জলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্তের গুটি ও তজ্জন্য দাহ দূর হয়।

এইরূপ আরও বহু মুষ্টিযোগ ; পাচন, বটী, প্রলেপ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর উল্লেখ করিলাম না। সকল প্রকার বসন্তেই উৎকৃষ্ট স্বর্ণসিন্দূর ব্যবহার করা যায়। শাস্ত্রমতে ইহাই এখন প্রধান ঔষধ। রোগের অবস্থা ভেদে বিভিন্ন অনুপানের সহিত সকল চিকিৎসকই প্রায় ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং যথেষ্ট ফলও পাওয়া যায়।

জলবসন্তের ও সাধারণ হামসংযুক্ত জ্বরের প্রায়ই চিকিৎসার আবশ্যক হয় না, একটু সাবধান থাকিলেই আরোগ্য হয়। আসল বসন্ত কিম্বা উপদ্রব যুক্ত হামের বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক। এ সমস্ত রোগে বহুদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকের উপরই নির্ভর করা উচিত। 'হাতুড়ে' চিকিৎসকের উপর ভার দেওয়া প্রায়ই নিরাপদ নহে।

বসন্ত হইলে ঔষধ না দেওয়াই অনেকের মত, বস্তুতঃ ইহা ঠিক নহে। বসন্তে কোন উপদ্রব না থাকিলে অথবা ভাল জাতীয় বসন্ত হইলে, ঔষধ না দিলেও তেমন ক্ষতি নাই। কিন্তু যখন বসন্তের যে উপদ্রব আসিবে তখন কালবিলম্ব না করিয়া সেই সেই রোগাধিকারের উপযুক্ত ঔষধ অবশ্যই দেওয়া উচিত।

এক দিকে ঔষধ প্রয়োগ রোগিশুশ্রূষা ও সুপথ্যের যেমন বিধান করিতে হইবে, তেমন এইরোগে ভয় নিবারণ, চিত্তশুদ্ধি ও সংক্রামকতা নিবারণের নিমিত্ত

দেবপূজা, স্বস্ত্যয়ন, কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্র বাক্যই ইহার সমর্থন করিয়াছে। শাস্ত্রে বসন্ত রোগকে পাপরোগ বলিয়া ও নির্দ্দেশ করিয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠানেই পাপের শান্তি হইয়া থাকে। এজন্য রোগের নিদান, সমস্ত পাপকার্য্য বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানেই শুভ হয়।

অপবিত্র স্থানে বাস ও কুৎসিৎ আহার বিহার হইতেই এ রোগ অধিক জন্মিয়া থাকে। অতএব সকলের পবিত্রস্থানে বাস বিশুদ্ধ আহার একান্ত আবশ্যক। রোগীকে যতদূর সম্ভব শুচিশুদ্ধভাবে রাখিবে। আর একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য, রাখিতে হইবে যে, রোগীকে পরিষ্কৃত সূক্ষ্মবস্ত্রনির্ম্মিত মশারির মধ্যে রাখিবে, তাহাতে রোগীর শরীরে মশা বা মাছি পড়িতে পারিবে না। ইহা রোগীর পক্ষে এবং অন্য সকলের পক্ষেই বিশেষ হিতকর। যে মশা রোগীকে দংশন করিয়া অন্য ব্যাক্তিকে দংশন করে তাহারও বসন্ত হইতে পারে। ঘরে ধূনা, গুগ্‌গুলু প্রভৃতির ধূপ দিলে মশা মাছিও নিবারণ হয়, রোগীর ও উপকার হইয়া থাকে। নিম ও নিশিন্দার পত্র সংযুক্ত শাখা শয্যায় ও গৃহের নানা স্থানে রাখিয়া দিলেও মাছি প্রভৃতির উপদ্রব ও সংক্রামকতা দূর হয়।

রোগের প্রথম অবস্থায় প্রথমতঃ আবশ্যক মত লঙ্ঘন, কফের আধিক্য ও পাকাশয়ে ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণভাবে থাকিলে বমন, কোষ্ঠ কঠিন থাকিলে মৃদু বিরেচন আবশ্যক। রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ বা প্রদাহ যুক্ত হইলে, মস্তকে জ্বালা বোধ হইলে, মস্তকে শীতল জলের পট্টি দিতে দোষ নাই। শ্লেষ্মার অল্পতা, গাত্রদাহ অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলে, পরিষ্কৃত ন্যাকড়া শীতল জলে ভিজাইয়া শরীর অল্প অল্প মুছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। অনেকে সকল অবস্থায়ই এইরূপ শীতল জলের পরিষেক বা রীতিমত স্নানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক বহুদর্শী চিকিৎসকই ইহার সমর্থন করেন না। আমরা ও ইহার পক্ষপাতী নহি। অনেকের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে, বসন্ত বা হাম হইলে ঠাণ্ডা জলের সেক ও স্নানাদি না দিলে গুটি গুলি বসিয়া যায় এবং রোগটি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই মতটি ও সম্পূর্ণ অনুমোদন করা যায় না। তাহার বিশিষ্ট কারণ আমরা সময়ান্তরে প্রদর্শন করিব।

তারপর পথ্যের কথা, পথ্য বিষয়েও অনেকের মত কেবল ঠাণ্ডা পথ্য দেওয়া, কার্য্যতঃ ও কোন কোন চিকিৎসক তীব্রজ্বর গাত্র বেদনা প্রভৃতি

লক্ষণ গুলি বিদ্যমান থাকা সত্বেও অম্ল, ঘোল প্রভৃতি পথ্য দিয়া থাকেন। এই নিয়মটিও সমস্ত অবস্থায় শুভফলদায়ক হয় না। জল বসন্ত, সাধারণ হাম ও বসন্ত রক্ত বা পিত্তগত হইলে, ঠাণ্ডা পথ্যাদিতে তেমন দোষ হয় না। ইহা ভিন্ন কফের অবস্থা বা সন্নিপাত অবস্থায় এরূপ করিলে বিষম অবস্থা দাঁড়ায়, ইহা আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। শাস্ত্র মানিয়া চলিলে এ রোগে অধিক শীত বা উষ্ণ না হয়, লঘু হয় তাহাই সাধারণ পথ্য। অবস্থা বিশেষ শীত বা উষ্ণ পথ্যাদি দিতেও হানি নাই। শুশ্রূষা প্রণালী ও পথ্য নির্ব্বাচন করাই বসন্তের প্রধান চিকিৎসা।

আয়ুর্ব্বেদে বসন্ত রোগীর এই সকল পথ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ উপবাস বমন, বিরেচন শিরাবেধ, চন্দ্রের কিরণ (জ্যোৎস্না) পুরাতন ষষ্টিক ও শালিধান্যের অন্ন, ছোলা, মুগ, মসূর, যব, পায়রা, চড়ুই, শুক প্রভৃতি প্রতুদ (যে সকল পক্ষী চঞ্চুদ্বারা ভক্ষ্য আহত করিয়া ভক্ষণ করে) পক্ষীর মাংস, করলা, পলাশ ফল, কাকরোল, কাঁচাকলা, সজিনা, ছোলঙ্গ, কিসমিস, দাড়িম, পবিত্র অথচ পুষ্টিকর অন্ন পানীয়, কোল (বড়ই), মাষকলায়ের যূষ প্রভৃতি হিতকর।

চক্ষুতে পীড়া হইলে যষ্টিমধু সিদ্ধজল শীতল করিয়া কিম্বা শামুকের জলদ্বারা চক্ষু পরিষেচন করিবে, অথবা কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিবে। মসূরী পক্ক হইলে মুগের যূষ, জাঙ্গল মাংসের রস, হেলেঞ্চাশাক, ঘৃত, নিসিন্দাপাতা, যুক্তি অনুসারে বিবিধ ধূপ প্রয়োগ, সর্ব্বদা শরীরে গোময় ভস্ম ঘর্ষণ ও মসূরী শুষ্ক হইলে নিম্বপত্র ও কাঁচা হরিদ্রা পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিবে। জ্বর ও বিসর্প রোগের পথ্যও বিবেচনা পূর্ব্বক দেওয়া যায়। নূতন শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্র রোগীকে ব্যবহার করিতে দিবে।

রোগীকে তৈল ব্যবহার করাইতে হইলে শুধু পোস্তদানার তৈলই আহারে ও মর্দ্দনে ব্যবহার করা যায়। গুটি গুলি পাকিয়া যখন পূয হয় তখন তাহাতে তৈল প্রয়োগ করিলে রোগী একটু আরাম বোধ করে, টিকাদার প্রভৃতি কোন কোন শ্রেণীর চিকিৎসক শুধু পাকাগুটি গুলি গালিয়া তাহাতে তিল তৈল প্রয়োগ করিয়া থাকে। ঐ তৈল অপক্ক গুটিতে লাগিলে সেই গুলি সহজে পাকেনা ও অনেকটা শক্ত হইয়া থাকে সুতরাং সাবধানে দেওয়া দরকার। পোস্তদানার তৈল সর্ব্বাঙ্গে দিতে ও দোষ

নাই। এই তৈল মস্তিষ্কে ও দেওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় যুক্তি অনুসারে অবস্থা বিশেষে এই তৈল দ্বারা কোন কোন দ্রব্য সহযোগে তৈল প্রস্তুত করিয়া দিলে ও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কোন কোন চিকিৎসক রোগের প্রথম হইতেই গুটির উপর মাখন দেওয়ার ব্যবস্থা দেন। অবস্থা বিশেষ মাখন ও অপকারী নহে, মাখন দিলে গুটিগুলি বেশ ভাসা ভাসা থাকে ভিতরে বসিয়া সাংঘাতিক হইতে পারে না। মাখন দিলে রোগী একটু যন্ত্রণা বোধ করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে বিসর্প ও বসন্তরোগের ঘৃত ও মাখন সংযুক্ত নানাবিধ প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেই সমুদয় প্রলেপ গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

ভৈষজ্য রত্নাবলীর মতে বসন্তরোগ শান্তির নিমিত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান, পোস্তদানার তৈল আহার ও মর্দ্দন, সুপক্ক বেল, গোদুগ্ধ, শর্করা, মাখন যব, গোধূম প্রভৃতি লঘু পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য।

চক্র দত্তের মতে দীর্ঘকাল তৈল না দেওয়াই প্রশস্ত। এই তৈল, তিল ও সর্ষপাদির তৈল বুঝিতে হইবে, পোস্তদানার তৈল দেওয়া যাইতে পারে। যেহেতু ইহাও শাস্ত্র সম্মত।

শুনিয়াছি কোন কোন দেশে নাকি বসন্ত হইলে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দম লেপিয়া দেয় এবং তাহাতে শীঘ্রই রোগী আরোগ্য লাভ করে। এ নিয়মটি যুক্তি-যুক্ত বলিয়াই বিবেচনা হয়। চরকে বিসর্প রোগে পদ্মিনী মূলের শীতল কর্দ্দমের প্রলেপ দেওয়ার বিধি দেখা যায়। বসন্ত হইলে শীতল জলের স্নান ও পরিষেক অপেক্ষা কর্দ্দমের প্রলেপ দেওয়াই সু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কর্দ্দম লেপনে রোমকূপগুলি বন্ধ হইয়া ভিতরে একপ্রকার উষ্মা বা তাপ জন্মে, সেই তাপ বাত, পিত্ত শ্লেষ্মা ও শোথের বিনাশ করে। সকল জাতীয় বসন্তেই শোথের প্রাবল্য থাকে বলিয়া ইহা উপকারী হওয়াই সম্ভব। লোকে যাহাকে বসন্ত "বসিয়া যাওয়া" বলে তাহাও একপক্ষে শোথরই কার্য্য। চর্ম্মোপরি শোথ জন্মিয়া গুটিগুলি নিম্নে বসিয়া যায়। ইহা একটু লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায়। অনেক অশিক্ষিত লোক শরীরে কোনস্থানে শোথ হইলে তাহাতে আঠাল মাটি কাদার মত করিয়া মাখাইয়া দেয় ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইহা দ্বারা বেশ ফল ও পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় যুক্তিদ্বারা ও আমরা ইহার সমর্থন

করিতে পারি। বসন্ত রোগে কর্দ্দম লেপের আর একটি বিশেষ উপকারিতা এই মনে হয় যে, রোগের সংক্রামকতা নিবারণ করিতেও ইহা সহায়তা করে।

বসন্ত রোগীর নিম্নলিখিত আহার বিহার একবারে বর্জ্জন করা উচিত। স্বেদ-ক্রিয়া, পরিশ্রম, তৈল, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, মৈথুন, (এমন কি স্ত্রীলোক দর্শন পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবে) পথচলা, গুরুদ্রব্য, ক্রোধ, রৌদ্র, দূষিত বায়ু, দূষিত জল, বিরুদ্ধ দ্রব্য ও অজীর্ণে ভোজন, শিম, আলু, শাক, লবণ, কটু ও অম্লদ্রব্য, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ প্রভৃতি। শিম বসন্ত রোগের অন্যতম কারণ শিম রোগীকে দেওয়া দূরে থাকুক বাড়ীতেও আনা উচিত নহে। বসন্তকালে শিমে একপ্রকার বসন্তের মত আকৃতি স্ফোটক দেখা যায়, সেই সকল শিম বেশী অপকারী। অনেকে বলে যে, উহাও শিমের বসন্ত বিশেষ।

মৎস্য ও গোদুগ্ধ বর্জ্জন সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। মৎস্য যে বসন্ত রোগের কারণ তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না। অন্ততঃ আয়ুর্ব্বেদে মৎস্য যে ইহার নিদান বা অপথ্য তাহার উল্লেখ নাই। বসন্ত রক্তদুষ্টি হইতে ও হইয়া থাকে, মৎস্য রক্ত-দুষ্টির অন্যতম কারণ বলিয়া মৎস্য ব্যবহার নিষেধ করা যায়। বসন্তকালে মৎস্যও দূষিত হয় সুতরাং সেইকালে মৎস্য সকলের পক্ষেই বর্জ্জন শ্রেয়ঃ।

কেবল সান্নিপাতিক অবস্থা ভিন্ন সকল অবস্থায়ই অল্প দুগ্ধ দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। গোরুর বসন্ত হয় এই ভয়ই অনেকটা দুগ্ধ ব্যবস্থা না দেওয়ার কারণ। সুস্থ গাভীর দুগ্ধ ঘৃত, মাখন, ঘোল প্রভৃতি সমস্তই বসন্ত রোগীর সুপথ্য। চিকিৎসক রোগীর দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক দুগ্ধাদি ব্যবস্থা করিবেন।

অনেকেই হয়তঃ মনে করিতে পারেন যে, যেখানে সেখানে মানুষের বসন্ত হয়, অনেকে মারাও পড়ে। কিন্তু গোরুর বসন্ত হয় ও মারা পড়ে তাহা বড় শুনা যায় না। এই প্রশ্নটি উঠা ও স্বাভাবিক। অনেকেই জানেন না যে, গোরুর বসন্ত কি প্রকার। বস্তুতঃ গোরুরও বসন্ত কম হয় না। কিন্তু মারা পড়ে কম এবং লোকে অনেক সময়ই গোরুর বসন্ত হইলেও তাহা বুঝিতে পারে না। তাহার কারণ গোরুর স্তনে ও বাঁটে মাত্র বসন্তের কয়েকটি গুটি প্রকাশ হয়, তাহা প্রায়ই মারাত্মক হয় না। বসন্তগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ যাহারা দোহন করে, তাহাদের শরীরে বসন্তের বীজ লাগিলে বসন্ত হয়, এই বসন্তই ক্রমে অন্যান্য মানুষের মধ্যে সংক্রা-মিত হয়। গোবীজ হইতে যে সকল বসন্ত উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও সাংঘাতিক

বা মারাত্মক হয় না, ইহা একরূপ পরীক্ষিত হইয়া স্থির হইয়াছে, এজন্যই গোবীজে টিকার অনিষ্টকারিতা কম।

কেহ কেহ অনুমান করেন গোবীজে টিকা দেওয়ার প্রথাও প্রথম ভারতবর্ষেই প্রচলিত হয়, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয় কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বহু গবেষণাদ্বারা ইহার কৃতকার্য্যতার বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও পুরস্কার লাভ করেন, তাহার প্রমাণ ইতিহাসে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে।

টিকা দেওয়া ব্যতীত বসন্তের প্রতিষেধক সর্ব্ববাদী সম্মত উৎকৃষ্ট ঔষধ কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানেই আবিষ্কৃত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদে বসন্তরোগের কতগুলি ঔষধই দৃষ্টহয় সত্য, কিন্তু আজকাল তাহাদের ব্যবহার না থাকায় তৎসম্বন্ধে কেহ কোনটি সাহস করিয়া প্রয়োগ করিতে পারে না। ঐ সকল ঔষধ বহুলভাবে পরীক্ষিত হইলে আমাদের বিশ্বাস উৎকৃষ্ট ঔষধ ও বাহির হইতে পারে। দেশে দিন দিন বসন্তের প্রকোপ যেরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে সমস্ত চিকিৎসকগণেরই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ভরসা করি এ বিষয়ে যিনি যাহা জানেন সাধারণের উপকারের জন্য প্রকাশ করিবেন। বসন্ত রোগ যে ভীষণ জনপদোদ্ধংসকর ব্যাধি তাহা সকলেই স্মরণ রাখিবেন এবং পূর্ব্বাহ্লেই সাবধান হইবেন।

বিদেশীয় চিকিৎসাতত্ত্ব।

"বহুধাপ্যাগমৈ ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।"

কালিদাস।

হিন্দু চিকিৎসা এক সময় জগতের পথ প্রদর্শক ছিল। কালক্রমে জাতীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তার স্রোত বিশুষ্ক হইয়া যাওয়ায় সেই হিন্দু চিকিৎসার অভিনব উদ্ভাবনী শক্তি ও মৌলিক গবেষণা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। চরকের বনজ-প্রধান ঔষধগুলির স্থলে বৌদ্ধ অথবা তান্ত্রিক যুগে ধাতব ঔষধের

ব্যবহার ক্রমশঃ প্রচলিত হইয়াছিল। তাহাতে দেশের কল্যাণ কি অকল্যাণ ঘটিয়াছিল এস্থলে আমরা তাহার আলোচনা করিব না। তবে ঐ নবোদ্ভাবিত ঔষধ প্রয়োগের প্রণালী দ্বারা তাৎকালীন আয়ুর্ব্বেদের সজীবতাই পরিলক্ষিত হইতেছে।

আজ কাল এতদ্দেশে নানা বিষয়িণী বিদ্যার বহুল প্রচারে সকলের মধ্যেই একটু তত্ত্বানুসন্ধিৎসা আসিয়াছে। কি সাহিত্য ক্ষেত্রে, কি বিজ্ঞান আলোচনায়, কি শিল্প বাণিজ্যে লোকের উন্নতি লাভের যথেষ্ট উদ্যম ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে। ইহা আধুনিক শিক্ষার একটী সুফল এবং সময়ের সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত যখন সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ও সজীব ছিল, তখন মনস্বিগণ বিদেশ হইতে সত্য সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বরং মধুকর যেমন স্নিগ্ধ পরিমল কমল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র দ্রোণ পুষ্পেরও মধু আহরণ করে, সেইরূপ নানা দিগ্‌ দেশ হইতে সারজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা স্বীয় শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বৈদ্যশাস্ত্রের ভাব প্রকাশে তোপচিনী প্রভৃতির নাম ও গুণ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের বরাহ মিহিরে রুমক গ্রন্থের কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আমরা বিদেশীয় তত্ত্ব সংগ্রহে সেই মহাজন অনুসৃত পন্থাই অবলম্বন করিতেছি। সত্য চিরকালই সত্য। বিভিন্ন শাস্ত্রোল্লিখিত পন্থা বিভিন্ন হইলেও সিদ্ধিই সকলের মূলমন্ত্র।

আমরা অদ্য মার্কিন দেশের নব প্রবর্ত্তিত লংঙ্ঘন চিকিৎসার (Fasting Cure) বিষয় আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য চরকসংহিতায় লঙ্ঘন বৃংহণীয় নামে যে অধ্যায় আছে এবং প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে ঐরূপ চিকিৎসার যে সকল নিয়মাবলী ও প্রণালী উল্লিখিত, আলোচিত এবং পরীক্ষিত হইয়াছে, যথাস্থানে তুলনার্থ তাহাও লিখিত হইবে।

লঙ্ঘন চিকিৎসা।

(Fasting cure)

এই বিষয়ে অবতারণা করিবার পূর্ব্বে, রোগ কি ? এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত মার্কিন চিকিৎসকদিগের মতে 'রোগ' বলিয়া কোনও পদার্থের পৃথক্ সত্তা নাই। যে কোনও রোগের সূচনা প্রকৃতির সতর্কী করণ মাত্র। দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ—অত্যাচারিত প্রকৃতির দীর্ঘ আর্ত্তনাদ। রোগের আবার চিকিৎসা কি ? স্বয়ং প্রকৃতিই যে চিকিৎসক।

যখন শরীরযন্ত্র একটু বিকল হইয়াছে লক্ষিত হয় ; তখনই বুঝিতে হইবে, প্রকৃতির বা স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে কোনও অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে, তখন প্রকৃতি বিপদ-নিশান দিয়া স্বয়ংই চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অধিক আহারে বা কোনও বিষাক্ত জিনিষ উদরস্থ হইলে, যে অসুখ জন্মে তজ্জন্য কি স্বয়ং প্রকৃতিই ব্যস্ত নহেন ? যে পর্য্যন্ত বিকল যন্ত্র স্বস্থ না হয়, যে পর্য্যন্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট বিষ নিঃসৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রকৃতিই তাহা স্বয়ং বাহিষ্কৃত করিয়া দিতে চেষ্টা করে।

ডাঃ এমেট্ ডেনস্ মোর তাঁহার "How nature cures" ("প্রকৃতির চিকিৎসা") নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "রোগ প্রকৃতিরই স্বাভাবিক প্রতিকার।"(১)

ডাঃ ট্রল বলিয়াছেন :—রোগ প্রকৃতির আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। ইহা দেহ বিশুদ্ধির উপায় ও রোগ প্রকৃতির আত্ম চিকিৎসা একই কথা।" (২)

"রোগ কি" ? এই প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রেইন হোল্ড বলিয়াছেন :—"যে সকল বিষাক্ত ও অসার পদার্থ শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চিত হইয়াছে এবং যাহার অস্তিত্ব মাথাধরা, অবসাদ, বেদনা প্রভৃতি দ্বারা আমাদের নিকট বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে, সেই সকল পদার্থের বহিষ্করণের প্রাকৃতিক প্রয়াস রোগ"। (৩)

ক্রমশঃ

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

(১) Disease is a "curative action of the pent of the ruling (vital) force." "All disease and all manifestations of disease are friendly efforts and curative actions made by the organisms in its efforts to restore health."

(২) Trall : "True Healing Art."

(৩) Reinhold : "Prevention and cure of Tuberculosis."

পরমায়ু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত ললিতারমণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

আহার বিধি।

৩১। আহারের পরই জলপান করা কর্ত্তব্য।

৩২। আচমনান্তে মুখের জল বস্ত্রাদিদ্বারা কখনও পোছা উচিত নয়, আচমনান্তে দুই হাত শীতল জলদ্বারা ভিজাইয়া ঐ হস্তদ্বারা আস্তে আস্তে প্রথম কপাল হইতে কর্ণের পশ্চাৎ দিয়া গ্রীবাদেশ দুই তিনবার পুছিবে, তৎপর কপাল হইতে সমস্ত মুখমণ্ডল আস্তে আস্তে পুনঃ পুনঃ পুছিয়া, হাত ও মুখমণ্ডলের জল শুষ্ক করিবে। ইহাতে মুখব্রণ হইবে না, আর মাথাধরা, মাথাঘুরা ও মাথা গরম হওয়া বিদূরিত হইবে।

৩৩। আহারের পর মুখ শুদ্ধ করা উচিত।

৩৪। গৃহী কখনও লবণ ভিন্ন হরীতকী খাইবে না। হরীতকী আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, ইহার গুণের অভাব নাই।

৩৫। তাম্বূল অতিশয় উপাদেয় এবং উপকারী খাদ্য, ইহার গুণ আয়ুর্ব্বেদেও বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে ; কিন্তু ব্যবহার দোষে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে।

৩৬। পান খাওয়ার নিয়ম :-

পানটি বেশ পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিবে এবং পরিষ্কার বস্ত্রাদি দ্বারা পুছিয়া ফেলিবে ; পরে বোঁটার নিকটের শিরাগুলির সন্ধিস্থান সহিত মধ্যস্থানের বড় শিরাটি ফেলিয়া দিবে, তৎপর পানের ভিতর দিকে চূণ জড়াইয়া দুইখণ্ড পানই হাতে লইয়া একটিদ্বারা অপরটি ঘর্ষণ করিয়া রাখিবে ; সুপারী ভিজাইয়া তাহার বিষাক্ত কষ ফেলিয়া দিবে, চূণ ছাকিয়া লইবে, কখনও উহা অনাবৃত রাখিবে না (পাথর চূণ বিষবৎ ত্যাগ করিবে। শম্বুক ও ঝিনুকের চূণ ব্যবহার্য্য।) কালখয়ের (সাদা খণ্ডাকৃতি খয়ের বিষবৎ ত্যাজ্য), পান সুপারী চূণ একত্র করতঃ মুখে দিয়া চিবাইবে। প্রথম যে রস বাহির হইবে, তাহা

বিষজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে, তৎপর যে রস বাহির হইবে, তাহাই পরম উপকারী, পরে ছোবরা ফেলিয়া মুখ ধৌত করিবে।

৩৭। বয়স্থ ব্যক্তির কোন কোন অবস্থা বিশেষে আহারান্তে ধূমপান প্রশস্ত। শূন্য উদরে ধূমপান করিলে গুরুতর ব্যাধি আক্রমণের বিশেষ আশঙ্কা।

৩৮। আহারান্তে মাথার ঠিক মধ্যস্থলে সিঁথী কাটিবে, ইহাতে মস্তিষ্ক অতিশয় শীতল থাকে। অভুক্ত অবস্থায় কথনও মাথা আচড়াইবে না।

৩৯। ধাতু বিশেষে মধ্যে মধ্যে উপবাস, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নিশিপালন উপকারী। পিত্ত প্রধান ধাতে এবং সুস্থ দেহে উপবাস বিশেষ অনিষ্টকারক।

৪০। সাত্ত্বিক দ্রব্য আহারে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি উত্তম সাত্ত্বিক দ্রব্য ইহারা পরমায়ু বর্দ্ধক ও পবিত্র।

৪১। ঘৃতের একটি নাম পরমায়ু, ইহার ন্যায় উপকারী খাদ্য জগতে আর নাই।

৪২। পিত্তদগ্ধ ব্যক্তি ঘৃত বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। অত্যুষ্ণ ঘৃত ভাতে অথবা দুগ্ধেই পরম হিতকর। (১) ঘৃত পরিপাক করা বর্ত্তমান সমাজে অধিকাংশেরই দুঃসাধ্য হইয়াছে, ঘৃত হজম করিতে সক্ষম ব্যক্তির কান্তি ও পুষ্টি অতিশয় কমনীয় হইবে।

৪৩। বিধবাগণ, যে সব সাত্ত্বিক বস্তু আহার করেন এবং বাহ্য শৌচ, আচার ব্রতাদি পালন করেন, তাহাদ্বারা তাঁহাদের সুস্থদেহ ও দীর্ঘ জীবনের যথেষ্ট সাহায্য হয়।

৪৪। মৎস্য মাংসাদি তামসিক আহার বর্জ্জন করাই ভাল। কাম, ক্রোধাদি দ্বারা যাহারা দেহ জীবন ক্ষয়করে, তাহাদের জন্যই মৎস্য মাংসাদি একান্ত দরকার।

১। আয়ুর্ব্বেদে ঘৃতকে পিত্তনাশক বলা হইয়াছে। স্থানান্তরে "স্নেহদ্রব্যের উপকারিতা" প্রবন্ধের লেখক ইহা আলোচনা করিয়াছেন। "পিত্ত দগ্ধ ব্যক্তির ঘৃত বিষবৎ বর্জ্জনীয়" এই কথার তাৎপর্য্য কি? "উষ্ণ ঘৃত দুগ্ধে হিতকর" এই কথা রও তাৎপর্য্য লিখিত না হওয়ায় লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইবে, যেহেতু প্রাচীনাদের মুখে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে, ঘৃত দুগ্ধ একত্র খাওয়া নিষেধ, বস্তুতঃ এরূপ ব্যবহারও নাই। "ঘিয়ে দুধে খেয়ে মোটা হয়" এরূপ একটি কথাও শুনা যায়, কিন্তু উহা পৃথক পৃথক খাওয়াই অর্থ। "পরমায়ু" লেখক তাহার লিখিত বাক্যদ্বয়ের যথোপযুক্ত সমর্থনানুকূল সমাধান করিয়া পাঠকের সংশয় নিরসন করিবেন। আমরা ঘৃত সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় বিচার তথ্য সময়ান্তরে প্রকাশ করিব। সম্পাদক।

৪৫। সহজ লভ্য পাথর কয়লার পাকে আহার করিলে দেহ জীবনের মহানিষ্ট হয়। পাথর কয়লার পাক, কেরোসিনের আলো, আর টিনের ঘরে বাস, এই তিনটি দেহ জীবন বিনাশের অতি সহজ কৌশল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

* * * * * *

দুগ্ধ ও ঘৃত (পরমায়ু)

মনুষ্যদেহ যে সব বস্তু বিধানে গঠিত হয়, তন্মধ্যে একমাত্র দুগ্ধই সর্ব্বপ্রধান, যে হেতু মনুষ্য দেহ পরিপোষণ ও রক্ষণোপযোগী সমস্ত বস্তুই দুগ্ধে বর্ত্তমান আছে। দুগ্ধ বলিতে জরায়ুজ জীব মাত্রেরই স্তন্যকে বুঝায়। ইহার মধ্যে গোদুগ্ধ, মনুষ্য দুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ মনুষ্যের পক্ষে উত্তম ও নিরাপদ পোষণকারী; এভিন্ন গাধা, ঘোড়া, উট, মহিষাদির দুগ্ধ ও মনুষ্য ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যের জন্য তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ নহে। মনুষ্যের পক্ষে শৈশবাস্থায় মনুষ্যও গোদুগ্ধই শ্রেষ্ঠ, গাধার দুগ্ধও মন্দ নহে। দুগ্ধ হইতেই ঘৃত উৎপন্ন হয়। আর্য্যযোগীগণ এই ঘৃতকে পরমায়ু নামে বর্ণনা করিয়াছে, প্রকৃত পক্ষেই ঘৃত আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সব বলবীর্য্য আয়ুর্ব্বর্দ্ধক রসায়ন যোগাদি লিখিত আছে, তাহা হইতেও ঘৃত শ্রেষ্ঠ বস্তু, দুগ্ধ হইতে ইহা অষ্টগুণ বলবর্দ্ধক, ঘৃতের ন্যায় আয়ুর্ব্বর্দ্ধক আর দ্বিতীয় বস্তু নাই।

পরমায়ু রক্ষা এবং বৃদ্ধি করিতে চাহিলে পরমায়ু (ঘৃত) আহারীয় বস্তুর সহিত রীতিমত ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। বলবীর্য্য মেধা, ইন্দ্রিয়াদির শক্তি রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র দুগ্ধই প্রধান। মানব জন্মের প্রধান হেতু একমাত্র উদ্ভিদ; ফল, মূল, বীজ পত্র পুষ্পাদি ও সম্পূর্ণ দন্তোদ্গমের পর হইতে রীতিমত গ্রহণ করা একান্ত দরকার। এসব বিষয় বিস্তৃত লিখিলে প্রবন্ধের আকার বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে।

বঙ্গীয় সমাজ আয়ু, বল, বীর্য্য ও সুস্থদেহ লাভের নিমিত্ত মাছ মাংসকেই শ্রেষ্ঠতর খাদ্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন, তাহা ও যথারীতি কেহ ব্যবহার করেন না। প্রাচীন বাক্য—

মাংসে মাংসবৃদ্ধি ঘৃতেবৃদ্ধি বল,
দুগ্ধে চন্দ্রবৃদ্ধি শাকেবৃদ্ধি মল,

মাছে বৃদ্ধি কাম রিপু
আউথে (আক) বৃদ্ধি জল
অকালে হয় ক্ষুধা বৃদ্ধি
সৃষ্টির কৌশল।
ধনে হয় কান্তি বৃদ্ধি ঋণে রসাতল। ইত্যাদি

গুণানুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা সনাতন বেদ মনু প্রভৃতি যথেষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। রজঃ ও তমোগুণ বিশিষ্ট দীর্ঘজীবন নাশক জন্তুর খাদ্য সৎ ও ধর্ম্মজীবন লাভেচ্ছু মুমুক্ষু-দের জন্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাজ্য, ইহা ভারতবাসী আর্য্য জাতির নিকট পুস্তক লিখিয়া প্রকাশকরা বড়ই লজ্জাজনক ও দুঃখের বিষয়। ভারতবাসী তৈল মর্দ্দনের জন্য, ঘৃত আহারীয় রন্ধনের জন্য চিরন্তন কাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। জানিনা কোন্ মহাপাপে আজ সেই দেবতুল্য ভারতীয় আর্য্য জাতির আহার বিহারের অভ্যন্তরে বলবীর্য্য আয়ুনাশক স্বাস্থ্য বিনষ্টকারী, মৎস্য মাংস তৈলাদি ব্যবহার বিধি প্রবেশ করিয়াছে। ঘৃত অন্যান্য সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বস্তুর সংযোগে ব্যবহার করিলে, দেহের অশেষবিধ উপকার সাধিত হয়। পিত্তবিকৃতি ভিন্ন, উদরের অগ্নির বলবুঝিয়া প্রত্যেকেই ইহা ব্যবহার করিতে পারে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রাজ অনুগ্রহ—জগতে যত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমুদয়ই রাজ অনুগ্রহে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। রাজার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন চিকিৎসা শাস্ত্রেরই তেমন প্রসার হইতে পারে নাই। হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু চিকিৎসার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ চিকিৎসার ও অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ বৌদ্ধ রাজত্বের সময় তান্ত্রিক চিকিৎসার খুব প্রচলন হইয়াছিল। পরে এ দেশে মুসলমান রাজত্বের সময় হেকেমী চিকিৎসারই সমধিক আদর হয়। ক্রমে ইংরেজদের এ দেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ইংরেজ

রাজত্বের অভ্যুত্থানের কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পাশ্চত্য চিকিৎসাই সগৌরবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রাজ অনুগ্রহই ইহার একমাত্র কারণ। এ দেশে নানাপ্রকার চিকিংসা প্রচলিত থাকিলেও ডাক্তারী চিকিৎসার প্রসার যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকা দেশে সে দেশের রাজ অনুমোদিত "হোমিওপ্যাথী" চিকিৎসার প্রতিপত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই এক এবং কোনটি অপেক্ষা কোনটি হীন না হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজপুরুষগণ ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসার অনুমোদন করিয়া আসিতেছেন।

আয়ুর্ব্বেদ যে, সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি ভূমি তাহা এখন কাহারো বুঝিতে বাকী নাই। বহু অন্তরায়ের মধ্য দিয়া ও আয়ুর্ব্বেদ আপন গৌরব অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

ইংরেজের আগমন এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসার ক্রমোন্নতি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অনেকটা অনুকূল হইয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তায় এখন অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্বের গভীরতা অনুভব করিতেছেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদকে ভালরূপ বুঝিতে হইলে- যে সকল কার্য্য আবশ্যক তাহার প্রায় কোনটিরই সূচনা দেখা যাইতেছে না। এ জন্য আদর্শ স্থানীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন, ভৈষজ্য উদ্যান প্রতিষ্ঠা, লুপ্ত প্রায় গ্রন্থ সমূহের উদ্ধার, আয়ুর্ব্বেদীয় তত্ত্বানুসন্ধানার্থ বৃত্তি দ্বারা উপযুক্ত লোক নিয়োগ, আদর্শ ভেষজ প্রস্তুতাগার ও তৎসহ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং এ সমুদয় বিষয়ের ফলাফল প্রচারের জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় পত্রিকা প্রকাশ একান্ত প্রয়োজন।

এই সকল কার্য্য সংগঠন করিতে বহু অর্থ ব্যয় ও সুবিজ্ঞ লোক সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের আবশ্যক। রাজ সহায়তা ব্যতিরেকে এমত সুবৃহৎ কার্য্য সকল কখনই সুশৃঙ্খল হইতে পারে না। আমরা এ সকল কার্য্যের জন্য দেশের মনস্বী ও সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমবেত উদ্যোগ এবং সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দুইশত বৎসর বাঁচিবার উপায়—জাপানের কোন বিজ্ঞলোক দুইশত বৎসর দীর্ঘায়ু লাভের সঙ্কেত বাহির করিয়াছেন। তাহার উপদেশ এই :—

১। যথাসাধ্য ঘরের বাহিরে থাকিও।

২। দিনে একবারের বেশী মাংস খাইওনা।

৩। প্রতিদিন গরম জলে স্নান করিও।

৪। মোটা পশমী বস্ত্র পরিও।

৫। অনুন ৬ ঘণ্টা ঘুমাইও কিন্তু ৭॥ ঘণ্টার বেশী ঘুমাইওনা। শয়নকালে ঘরের জানালা খুলিয়া রাখিও এবং ঘর অন্ধকার করিও।

৬। সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম করিও।

৭। ক্রোধ করিওনা এবং মস্তিষ্কের অতিরিক্ত চালনা করিও না।

৮। বিধবা ও বিপত্নীকদের বিবাহ করা উচিত।

৯। বেশী পরিশ্রম করিও না।

১০। বেশী কথা বলিও না।"

যিনি এই সকল নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়জন এই নিয়মে, দুইশত বৎসর আয়ুলাভ করিয়াছে এবং তাহার নিজের বয়সই বা কত? এই প্রশ্নটিই প্রথম সকলের মনে উদিত হইবে। অবশ্য তিনি সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই, তবে নিয়মগুলি যে দীর্ঘায়ুলাভের সহায় তাহা বোধ হয় সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু সকল দেশের পক্ষে সকল নিয়মগুলিই যে খাটিবে তাহা স্বীকার করা যায় না। উষ্ণ জলে স্নান ও মোটা পশমী বস্ত্র ব্যবহার গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে সর্ব্বাংশে উপযোগী নহে। বিধবা ও বিপত্নীকদের বিবাহ অন্য সকল দেশের উপযোগী হইলেও ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রতাদি পালনকারী ভারতবাসী হিন্দুর পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না। যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনে অসমর্থ তাহাদের বিবাহ করা সঙ্গত হইতে পারে।

মানুষের দুইশত বৎসর বাঁচিবার দৃষ্টান্ত বিরল। একশত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে অনেককে দেখা যায়। আয়ুর যে কোন নিয়ত কাল নাই তাহা আয়ুর্ব্বেদের মতে সমর্থন করা যায়। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ২৮০ এবং বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী ১৬৬ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত পাঠে এরূপ অবগত হওয়া যায়। যোগবলই যে ইহাঁদের দীর্ঘায়ুর একমাত্র কারণ তাহা নিশ্চিত।

"প্রাণো বা অমৃতম্" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ

স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক

মাসিক পত্র

"আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥"
(বাগ্‌ভট।)

কবিরাজ
শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন কাব্যতীর্থ, বাচস্পতি
সম্পাদিত।

প্রকাশক—শ্রীকামিনীকুমার সেন এম্, এ, বি, এল।
"আর্য্য ভৈষজ্য নিকেতন"
ঢাকা।

প্রথম বর্ষ।

১৩২০।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ কার্য্যালয়—পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ

প্রথম বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচী

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ, বহু শাস্ত্রদর্শী, প্রত্যক্ষ শারীর সিদ্ধান্ত নিদান প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেবদীয় সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ এল, এম এস, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ মহোদয় বলেন।

প্রায় এক বৎসর আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ নিয়মিত রূপে পাইয়া থাকি এবং সাদরে পাঠ করিয়া আসিতেছি। পত্রিকাখানি উত্তম রূপে সম্পাদিত হইতেছে এবং ইহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলি প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। সম্পাদক মহাশয় যেরূপ উৎসাহী ও সুশিক্ষিত, তাহাতে নববর্ষে পত্রিকাখানির অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। এ সময়ে ভারতের নানাস্থানে নানাভাষায় অসংখ্য আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র, পাক্ষিক পত্র, এমন কি সাপ্তাহিক পত্র পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতেছে—হতভাগ্য বঙ্গদেশের দুরদৃষ্টে অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া কালকবলে পতিত হইয়াছে—এ সময়ে আয়ুর্ব্বেদবিকাশই নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গদেশের নাম রাখিতেছে। আশা করি, বাঙ্গালার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলী আয়ুর্ব্বেদানুরাগি-গণ এবং এই পত্রিকার গ্রাহক ও লেখক— এই "আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ" বা আয়ুর্ব্বেদ প্রদীপকে চিরোজ্জ্বল করিয়া রাখিবেন।

ভরসা করা যায় এই পত্রিকা বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় পত্রিকা বলিয়া কালে পরিগণিত হইবে।

সবিনয় নিবেদন এই—

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। দিন দিন লোকের শরীর যেরূপ রোগপ্রবল হইতেছে তাহাতে এইরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার যে বাঞ্ছনীয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আশা করি শিক্ষিত গ্রহস্থ মাত্রই এই উপাদেয় পত্রিকার সমাদর করিবেন। ইতি

নিবেদক—শ্রীঅন্নদাকুমার সেন সজ্জন, (ময়মনসিংহ)।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় !

অতীব আনন্দের সহিত নিবেদিতেছি আপনার প্রথম সংখ্যক আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ পাইয়া মনে করিয়াছিলাম এই উৎসাহ ক্ষণ স্থায়ী, সুতরাং উহা দ্বারা কবিরাজ গণের উন্নতি দূরের কথা এবং জনসমাজে উপহাস্যাস্পদ হইতে হইবে। এক্ষণ উহা যথাক্রমে একাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত দেখিয়া বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি। পরন্তু আমি এ পর্য্যন্ত সাদরে প্রতি পত্রই পাঠ করিতেছি এবং তাহাতে অনেক অভিনব বিষয়ে উপদেশ পাইতেছি। আমার বিশ্বাস ঐরূপ আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ পত্রিকা ভারতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি, বিশেষতঃ চিকিৎসকমণ্ডলী সাদরে পাঠ করতঃ তদনুসারে ক্রিয়াবান্ হইলে দীর্ঘজীবন লাভের এবং চিকিৎসাবিষয়ক উন্নতির সুপথ অবলম্বন করা হয়। আশাকরি প্রতিমাসেই পত্রিকা জন সমাজের নয়ন গোচর হইয়া পাঠক মণ্ডলীর উন্নতি সাধনে তৎপর হইবে। মাননীয় বিশেষজ্ঞ লেখক মহাশয়গণকে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া জগদম্বা সমীপে তাঁহাদের দীর্ঘায়ুঃ ও কুশল প্রার্থনা করিতেছি। নিবেদনমিতি।

বিনীত—শ্রীঅন্নদাকুমার সেনগুপ্ত কাব্যরত্ন কবিরঞ্জন পটুয়াখালী, ১৩২০।২০।

সকলেই জানেন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের মূলকারণ স্বাস্থ্য. স্বাস্থ্য না থাকিলে ইহার কোনটীতেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। সুতরাং মানব মাত্রেরই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশে সরল ভাষায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং এতৎ পাঠে মানব মাত্রেরই যার পর নাই উপকার হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যাহারা চিকিৎসার্থী তাহারাও এই পত্রিকাদ্বারা বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের অতি জটিল বিষয়গুলি সুন্দররূপে মীমাংসিত হইতেছে।

ইহাতে বসন্তরোগ ও তাহার প্রতিকার, পরমায়ুঃ, প্রাচীন ভারতের স্বাস্থ্যতত্ত্ব, স্বপ্ন প্রসঙ্গ, মৃগনাভি, বিষ চিকিৎসা, সোমলতা, খাদ্যাখাদ্য বিচার, প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি অতি দক্ষতার সহিত সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। পল্লী চিকিৎসক শীর্ষক প্রবন্ধ গল্পচ্ছলে সোজা কথায় অতি সুন্দর উপদেশ দিতেছেন। এই পত্রিকাখানি বঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব স্বরূপ। মাসিক পত্রিকার কোমল পদ্য ও কল্পিত গল্প পাঠ করিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদ বিকাশের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ পাঠে স্বাস্থ্য লাভ করা সহস্র গুণ শ্রেয়স্কর। আমরা এই পত্রিকার সর্ব্বদা দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।
১৩২০।২১ চৈত্র।

শ্রী গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন (ময়মনসিংহ)।

কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার সহকারী সভাপতি মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত কবিরাজ সুধাংশুভূষণ সেন কাব্যতীর্থ সম্পাদিত আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। পত্রিকাখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়ের আত্যন্তিক যত্ন ও উৎসাহ দেখিয়া আশা করা যায় কালে ইহা পূর্ণ কলেবর প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে।

যে একনিষ্ঠতা, গুণগ্রাহিতা, কঠোর ও অক্লান্ত শ্রমশীলতা গুণে পাশ্চাত্য জাতি এখন দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে এদেশ তাহাদের অনেক বিষয় অনুকরণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিতেছে সত্য বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের যে অংশের অনুকরণে দেশের ও সমাজের উন্নতি সেদিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িতেছেনা। পাশ্চাত্য দেশে কোন উন্নতিকর ও মঙ্গলজনক কোন বিষয়ের আবির্ভাব হইলে সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাহার উন্নতিবিধান করিয়া থাকে। আমাদের দেশে সেরূপ সহানুভূতির অভাবেই কোনরূপ উন্নতিকর বিষয়ে কাহারো কাহারো চেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ সুফল লাভ হইতেছেনা।

পাশ্চাত্যগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের নূতন ২ উন্নতির পন্থা আবিষ্কার করতঃ চিকিৎসা জগতে অসাধারণ চমৎকারিত্ব দেখাইতেছে। তাহাদের দেশে চিকিৎসা বিষয়ক কত মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়া দেশবাসীর অশেষ যত্ন উৎসাহে দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ উন্নতির পথে দিন২ অগ্রসর হইতেছে। আমাদের দেশে বহু অর্থ অযথাভাবে ব্যয়িত হইয়া থাকে। সামান্য ২।৩টী টাকা বার্ষিক প্রদান করিলে যাহার জীবন, রক্ষা হইতে পারে, তাহাকে জীবিত রাখা দেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

কবিরাজ সুধাংশুভূষণের এ অভিনব উদ্যমে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কেন শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত।

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন শাস্ত্রী। ৩১নং শোভাবাজার।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন এই—

আপনারা মহান্ হিতব্রতে ব্রতী, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে পত্রিকা খানীর যথাসাধ্য সাহায্য করা ব্যবসায়ী মাত্রেরই কর্ত্তব্য জগদীশ্বরের নিকট পত্রিকাখানীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি এবং আপনাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের শত মুখে প্রশংসা করিতেছি।

নিং—কবিরাজ শ্রীললিত মোহন দাশগুপ্ত (মাদারীপুর)।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

ভগবান আপনার উন্নতি ও দীর্ঘ জীবন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মুখোজ্জ্বল করান এবং আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ দীর্ঘ জীবন লাভ করুক এই প্রার্থনা। ইতি

নিবেদক—শ্রীশ্যামাচরণ দাশগুপ্ত বানরীপাড়া বরিশাল।

মহিমবরেষু—

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ মাসিক পত্রখানা দেখিয়া সুখী হইলাম। এইরূপ মাসিক পত্র দ্বারা যে লোকের উপকার হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, সুতরাং আমাকে গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত করিয়া পত্রিকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। ইতি

নিং—শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় উকীল পাবনা।

প্রিয় কবিরাজ মহাশয়—

আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আপনারা যে সাধু সংকল্প লইয়া আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, সেজন্য আপনারা অত্যন্ত ধন্যবাদার্হ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনাদের সদভিপ্রায় সফল হউক।

শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল নেত্রকোণা।

মহাশয়!

আপনাদের পত্রিকা পাঠে আনন্দ লাভ করিতেছি, ভগবান্ আপনাদের এই সাধু উদ্দেশ্যে সহায় হউন। ভরসা করি দিন দিন ইহার উন্নতি সাধিত হইবে। ইতি

নিং—শ্রীবরদাকিঙ্কর কাব্যতীর্থ।

গ্রাম ব্রাহ্মণ বাহনাদি পোঃ পাঁচদোনা জিঃ ঢাকা।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ দেখিয়া অতিশয় আনন্দানুভব করিতেছি। ভগবান্ আপনার আয়ুর্ব্বেদ বিকাশের বল, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু বিধান করুন। ইতি

নিবেদক—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাশ গুপ্ত উকিল সিরাজগঞ্জ।

বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রধান সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিমোহন দাশগুপ্ত কবিরত্ন মহোদয় লিখিয়াছেন—

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশের প্রবন্ধগুলি বেশ হইয়াছে। পত্রিকাখানার উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা করিতেছি।

শ্রীহরিমোহন দাশগুপ্ত বেজগাঁও (ঢাকা)।

টোল বাসাইল হইতে শ্রীযুক্ত জলধর কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

.. ..পত্রিকাখানী আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী মনে করি। ————প্রভৃতি পত্রিকা না রাখিয়া এই পত্রিকাই রাখিব আশা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রয়াগের প্রসিদ্ধ বৈদ্যক মাসিক পত্রের সম্পাদক আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল, তথা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠের মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগন্নাথপ্রসাদ শুক্ল বৈদ্য মহোদয় হিন্দী ভাষায় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—

মহাশয়, আপনার পত্রিকায় যে সকল বিষয়ের বর্ণনা দেখিলাম তাহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এই পত্রিকা লিখিয়া আপনি দেশের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন, আমি আশাকরি পত্রিকাখানি আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়া দেশের ও চিকিৎসকগণের উপকার করিতে থাকিবে।

ভবদীয়—জগন্নাথপ্রসাদ শুক্ল মন্ত্রী (প্রয়াগ)।

আপনারা দেশের যে একটি নষ্ট উদ্ধারকরিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস রীতিমত ভাবে কাগজ চালাইলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। আমি আশাকরি চিকিৎসক সম্প্রদায় বিশেষতঃ বৈদ্য সন্তান মাত্রেই আপনাদের সহায় হইবেন।

নিবেদক—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাশ গুপ্ত সিবিলকোর্ট কমিশনার, খুলনা।

সংবাদ পত্রের মতামত।

বসুমতী বলেন ঃ—

এই পত্রখানির যে কয় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে; তাহা পড়িয়া আমরা বেশ সুখী হইয়াছি, প্রবন্ধগুলীর অধিকাংশই সার-গর্ভ। আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশকে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে দেখিলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গলী বলিতেছেন ঃ—

This is a monthly magazine in Bengal dealing with important subjects of hygiene and treatment of diseases according to the Ayurvedic system. The Editor, Kaviraj Sudhansn Bhusan Sen Gupta Kavyatirtha, has, in the issues before us, given Promise of future success. The magazine is published from Arya Vaishaijya Niketan, Dacca; and the annual subscription is two rupees only. The magazine deserves public patronage.

ঢাকা গেজেটের মত ঃ—

বর্ত্তমান সনের বৈশাখ হইতে উক্ত পত্রিকা খানা আমরা নিয়মিতরূপে পাইতেছি। এ পর্য্যন্ত যে সকল সংখ্যা বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয়েই বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় আমাদের বিশেষ পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয়। তিনি যেরূপ সুশিক্ষিত, তেমনই কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তিনি যে এই পত্রিকা খানার সাহায্যে নূতন নূতন আয়ুর্ব্বেদীয় গবেষণামূলক আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিবেন তাহা বেশ অনুমিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোক এখনও এই শ্রেণীর পত্রিকার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না, ইহাই দুঃখের বিষয়। সাধারণের উৎসাহের অভাবে এরূপ অতি প্রয়োজনীয় উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রখানার বিলোপ না ঘটে।

তাহাই আমরা দেখিতে চাই। পত্রিকা খানায় অনেকগুলি প্রবন্ধই পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি ইহা যে কেবল চিকিৎসকগণেরই আবশ্যক এমন নহে। সকল শ্রেণীর লোকেরই পাঠোপযোগী। বিষয় সকল অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। অনেক খ্যাতনামা লেখকের প্রবন্ধই ইহাতে দৃষ্ট হইল আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকা খানার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ চিকিৎসক সম্প্রদায় মধ্যে, পত্রিকা খানার আদর দেখিলে সুখী হইব।

শিক্ষাসমাচার লিখিয়াছেন ঃ—

আমরা এই নূতন অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি এবং বঙ্গীয় মাসিক-সাহিত্য-মহলে ইঁহার আসন সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা কামনা করিতেছি। আমরা কতিপয় সংখ্যা পড়িয়া বেশ বুঝিতেপারিয়াছি, সাহিত্যানুশীলনপরায়ণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় এই আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা পরিচালনরূপ দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যটি প্রিয়ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিষ্ঠার সহিত ব্রত পালনে মনোযোগী হইয়াছেন। পত্রিকাখানি এই ভাবে চালিত হইলে ইহা দ্বারা সমাজের বিস্তর উপকার হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা এই কয় সংখ্যাতেই অনেক প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কথা অতি সুন্দররূপে বিবৃত দেখিতে পাইয়াছি সরল সহজ বঙ্গভাষায় স্বাস্থ্যরক্ষাসম্পর্কিত তত্ত্বালোচনা যত অধিক হইবে ততই একটা বিশেষ দিক দিয়া জনশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত হইবে। সুতরাং দেশে "আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ" এর ন্যায় মাসিক পত্রিকা সৃষ্টির যে বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন ঃ—

ঢাকার মাসিকপত্ররূপে আয়ুর্ব্বেদীয় পত্রের বিকাশ ও এই বিঘ্নসঙ্কুল গুরুতর কার্য্যে সাহসপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া উদ্যম ও উৎসাহশীল কবিরাজ সুধাংশুভূষণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি, সুধাংশু-ভূষণের এই বিকাশের শুভসুযোগে আয়ুর্ব্বেদতত্ত্বে সুপণ্ডিত অন্যান্য বহুদর্শী প্রবীণ কবিরাজগণও তাঁহাদিগের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল সাধারণ্যে প্রচার করিয়া লোকের উপকার সাধনে যত্নবান্ হইবেন। আমরা ইহার

চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিষয় সঙ্কলন, এই ক্ষুদ্র পত্রিকার পক্ষে যতদূর সম্ভবপর, উদ্দেশ্যের অনুরূপ হইতেছে বলিয়াই আমরা মনে করি। ভাষা সরল ও বিষয়ের উপযোগী। পত্রিকাখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ,—ব্রতসংকল্প অতি মহান; উদ্দেশ্য সর্ব্বসুখের আকর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের পথ-প্রদর্শন,—লোকসমাজে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় হিতকর অনুষ্ঠান আর কি হইতে পারে? উপসংহারে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি, "আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশের" পরিশ্রম ও যত্ন সর্ব্বথা সার্থক হউক, অন্যকে দীর্ঘজীবনের পথ দেখাইয়া আপনিও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুন। বঙ্গীয় পাঠক সমাজ তৃষার্ত্তচিত্তে অবিশ্রান্ত উপন্যাসের ভ্রান্ত মরীচিকার অনুসরণে দিনপাত না করিয়া, অথবা তরল সাহিত্যের তরল মাধুরীতে মোহিত না থাকিয়া সারসত্যের অনুরাগী হইয়া উঠুন; এই শ্রেণীর বিষয়, পাঠক সমাজে সমাদৃত হউক।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ বলেন :—

ঢাকার অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুধাংশু ভূষণ সেন কাব্যতীর্থ বাচস্পতি সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। আমরা ইতঃপূর্ব্বে সমালোচনা প্রসঙ্গে "আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশের" সবিশেষ পরিচয় দান করিয়াছি। আমরা সম্প্রতি মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশ পাঠ করিয়া ইহার ক্রমোন্নতি দর্শনে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। সমালোচ্য সংখ্যার পত্রিকাখানি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সারগর্ভ প্রবন্ধের সমাবেশে বিশেষ গৌরবের সামগ্রী বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশের ন্যায় উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের প্রচার যত বেশী হইবে ততই দেশের মঙ্গল বলিয়া মনে করিব।

অন্যান্য বহু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ সম্বন্ধে বিশিষ্ট অনুকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছে বিভিন্নস্থল হইতে ও আয়ুর্ব্বেদ বিকাশের পাঠক ও গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া সহানুভূতির সহিত প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছেন, স্থানাভাব বশতঃ সকলের পত্র উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না বলিয়া সহৃদয় মহাত্মাগণ আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আমরা অতি বিনীত ভাবে সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

"প্রাণোবা অমৃতম্।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র।)

"আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥"

বাগ্‌ভট।

১ম বর্ষ } চৈত্র, ১৩২০ { ১২শ সাখ্যা।

"বৈদ্যাবতংস"

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ, এল, এম, এস।

বিদ্যানিধি, কবিভূষণ লিখিত।

ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদের জাগৃতি।*

(১)

আয়ুর্ব্বেদ কেবল ভারতবর্ষের শাস্ত্র নহে—আয়ুর্ব্বেদ সমগ্র জগতের শাস্ত্র। এই শাস্ত্র হইতেই পৃথিবীর সকল চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। আয়ুর্ব্বেদের মহিমাকীর্ত্তন অনেকেই করিয়াছেন। স্থানান্তরে আমি ও ২।৪ বার করিয়াছি। অদ্যকার প্রবন্ধের উহা বিষয় নহে। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়—আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন গৌরবান্বিত অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা এবং আয়ুর্ব্বেদকে

* কলিকাতা "আয়ুর্ব্বেদ সভা"র লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

পুনরায় পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমগ্র ভারত জুড়িয়া যে সকল উৎসাহান্বিত আন্দোলন ও আয়োজন হইতেছে ও হইয়াছে—তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান। শাস্ত্রের মীমাংসা, শাস্ত্রের উদ্ধার—পরের কথা। কোন্ কোন্ উপায়ে উহা করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনাই এখন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

এককালে সমগ্র জগৎ আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী ছিল, সে কথা এখন নানাবিধ যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করিতে হয়। কিন্তু এই বিশাল মহাদেশ ভারতবর্ষের বারো আনা লোক যে এখনও আয়ুর্ব্বেদের কৃপাতেই রোগমুক্ত হইতেছে, সে কথা স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য। কারণ, ভারতের লোক সংখ্যার তুলনায় সরকারী ও বে-সরকারী যোগ্য ডাক্তারের সংখ্যা এখনও মুষ্টিমেয়।

আয়ুর্ব্বেদের কল্যাণে ভারতীয় প্রজার তিন চতুর্থাংশ এখনও রোগমুক্ত হইতেছে বলিলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সকল স্থলেই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণ—বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ মতানুসারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিকিৎসা করিতেছেন। যদি তাহাই হইত, তবে আজ এই প্রবন্ধের প্রয়োজন হইত না। কথা এই যে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সামান্য সামান্য অংশ লইয়া ও আজ পর্য্যন্ত ভারতের সকল স্থানেই শত শত অল্পজ্ঞ বা বহুজ্ঞ চিকিৎসকগণ—রোগিগণকে প্রাণদান করিতেছেন। এই হিসাবে এই গৌরব-শেষ এখনও বর্ত্তমান,—এখনও আমরা ইহার উল্লেখ করিয়া গর্ব্ব করিতে পারি।

কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের বিলুপ্ত প্রাচীন গৌরবের তুলনায় এই গৌরব-শেষ এখন অকিঞ্চিৎকর। যে আয়ুর্ব্বেদ এককালে জগতের যাবতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের পিতৃস্বরূপ ছিল, যে বৃদ্ধ পিতা এখনও নিজ সামর্থ্যে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবন ধারণ ও জীবন প্রদান করিতেছেন,—কালের কঠোর প্রভাবে ও ভারতের দুর্ভাগ্যে তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখন জীর্ণশীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার সেই মহাশক্তি এখন প্রতিদিন ক্ষীণ হইতেছে—তাঁহারই যোগ্য ও অযোগ্য কর্ম্মঠ পুত্রগণ পূর্ব্ব পরিচয় ভুলিয়া আজ তাঁহাকেই স্থানচ্যুত করিতে উদ্যত। দেশের সুপুত্রগণ এখন বৃদ্ধ পিতাকে রসায়ন প্রয়োগে নব জীবন প্রদান না করিলে বৃদ্ধপিতা কতদিন এই আক্রমণ সহ্য করিতে পারিবে?

বলিতে লজ্জা হয়,—আয়ুর্ব্বেদের বিলুপ্ত প্রাচীন গৌরবের কথা, কেবল বিদেশীয়েরাই নহে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের চিরোপাসক ভারতীয় পণ্ডিত গণও এখন ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়—উহাই আয়ুর্ব্বেদ। তাঁহারা এই ভগ্নাবশেষ লইয়াই বলেন—"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নাস্তীহ ন তৎ ক্বচিৎ" অর্থাৎ যাহা ইহাতে (বর্ত্তমান চরক সংহিতায়) আছে তাহাই অন্য সকল চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে, যাহা ইহাতে নাই, তাহা কোথাও নাই। এইরূপ বৃথাভিমান যাহাঁরা করিয়া থাকেন, তাহাঁরা সম্ভবতঃ অবগত নহেন যে, ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব কতদূর খর্ব্ব করা হইতেছে এবং যথার্থই সত্যের অপলাপ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের পথ রুদ্ধ করা হইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন গৌরবের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত পরিচয় মদীয় "প্রত্যক্ষশারীর" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বৃহৎ ভূমিকায় (উপোদ্‌ঘাতভাগে) নানাবিধ প্রমাণ সহ দিয়াছি। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ বিলুপ্ত প্রাচীন সংহিতা গুলির নামোল্লেখ মাত্র করিব। অল্লাধিক ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বের টীকাকার ডল্লন ও চক্রপাণি এবং তৎপরবর্ত্তী টীকাকার বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠদত্ত প্রভৃতি যে সকল আর্ষ সংহিতা পাইয়াছিলেন,—সেই সকল সংহিতার—প্রমাণ সমূহ সংগ্রহ করিলে দেখা যায় যে, সে সময়েও অন্ততঃ ৪০।৪৫ খানি আর্যসংহিতা পাওয়া যাইত। সেই সকল সংহিতার—মধ্যে ২।৩ খানির ভগ্নাবশেষ এখন বর্ত্তমান। অন্য গুলি দারুণ রাজবিপ্লবাদি ও গৃহদাহাদিতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ দেশ-ব্যাপী যত্ন হইলে ২।৪ খানি এখনই পাওয়া যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আট অঙ্গে বিভক্ত—(১) শল্যতন্ত্র বা সার্জারি (Surgery including midwifery (২) শালাক্যতন্ত্র বা নাসা চক্ষু কর্ণ কণ্ঠাদিগত রোগ চিকিৎসা (Treatment of the Diseases of the eye Ear, nose and Throat (৩) কায় চিকিৎসা (Practice of medicine), (৪) ভূতবিদ্যা বা মানসিক রোগ সমূহের চিকিৎসা (Treatment of mental Diseases (৫) কৌমারভৃত্য বা শিশু ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা (Diseases of children and Gynarcology) (৬) অগদতন্ত্র বা

বিষ চিকিৎসা (Toxicology), (৭) রসায়ন বা জরাব্যাধিবিনাশন চিকিৎসা এবং (৮) বাজীকরণ বা ক্ষীণধাতু পুরুষের ধাতু পোষণ চিকিৎসা। শেষোক্ত চিকিৎসাঙ্গ দুইটী আয়ুর্ব্বেদের নিজস্ব। এই রসায়ন চিকিৎসার উৎকর্ষ বা পূর্ণতা রসতন্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকগণ করিয়াছিলেন,—তাহাতেই বিখ্যাত রসগ্রন্থসমূহের (রসহৃদয়, রসরত্নসমুচ্চয়, রসেন্দ্রচূড়ামণি, রসরত্নাকর, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—প্রভৃতির) উৎপত্তি। আর বাজীকরণ অঙ্গের বিশেষ উৎকর্ষ কামশাস্ত্রবিদ্‌গণ করিয়াছিলেন—যাহার কিয়দংশ এখনও য়ুনানী বা হাকিমী চিকিৎসায় প্রবেশ লাভ করিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের শল্যতন্ত্র ও শালক্যতন্ত্রই যে পরম্পরায় গ্রীস্ ও রোম ঘুরিয়া—পাশ্চাত্য জগতের শস্ত্র চিকিৎসা ও প্রসূতি তন্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে এবং পাশ্চাত্য যন্ত্র শস্ত্র সমূহের পোনেরো আনা অংশ যে অদ্যাপি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষণ মিলাইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা আমি "আয়ুর্ব্বেদোক্ত যন্ত্র শস্ত্রাদি ও পাশ্চাত্য সার্জারি" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এস্থলে সে সকল কথায় পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সেকালে এই অষ্টাঙ্গ বিশাল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গ লইয়া পৃথক্ যাহাঁরা বিশেষভাবে অনুশীলন করিতেন, তাহাঁরা সেই সেই অঙ্গের বিশেষজ্ঞ (Specialist) বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন। এখন ডাক্তারী চিকিৎসায় এইরূপ Specialist দেখা যায়, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার এক অঙ্গেরও সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ বিরল। বস্তুতঃ আয়ুর্ব্বেদ এখন একটী মাত্র অঙ্গ 'কায়চিকিৎসা' লইয়া কষ্টে স্বষ্টে জীবিত আছে। কষ্টে স্বষ্টে, কারণ ঐ অঙ্গও এখন অর্দ্ধেক বিলুপ্ত। কায়চিকিৎসার উপযোগী অনেক বনৌষধি এখন পাওয়া যায় না বা সুপরিচিত নহে। কায়চিকিৎসার অর্দ্ধেক ভাগ যে বস্তিপ্রয়োগ (নানাবিধ Medicated Enemate),—যাহার প্রভাবে কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বেও বৈদ্যগণ অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন, সেই বস্তিপ্রয়োগ এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বৈদ্য এখন বস্তি বা এনিমা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলে লোকে উহাকে ডাক্তারী ব্যবস্থা মনে করে!! আর শস্ত্র চিকিৎসা,—উহা যেন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সর্ব্বতোভাবে বিরুদ্ধ। কবিরাজ মহাশয় কোন রোগে শস্ত্রোপচারেব ব্যবস্থা করিলে লোকে উহাকে অনধিকার চর্চ্চা মনে

করিয়া তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ করে। আর রসায়ন ও বাজীকরণ নামক যে দুইটী প্রধান অঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের বাহুস্বরূপ,—ব্যবহারের অভাবে উহারা এখন অস্থিচর্ম্মাবশেষ। "রসায়ন" কথাটী পর্য্যন্ত এখন বাঙ্গালার কেমিষ্ট্রি বা ধাতুবিদ্যা লেখকগণ কাড়িয়া লইয়াছেন !!

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের যে সকল প্রধান প্রধান আর্ষ সংহিতা ৮৷৯ শত বর্ষ পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, সেগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

১। শল্যতন্ত্রে—ঔপধেনবসংহিতা, ঔরভ্রসংহিতা, বৃদ্ধ সুশ্রুত সংহিতা, পৌষ্কলাবতসংহিতা, বৈতরণসংহিতা, ভোজসংহিতা, করবীর্য্যসংহিতা, গোপুররক্ষিতসংহিতা, ভালুকিসংহিতা (৯ খানি)।

২। শালাক্যতন্ত্রে—বিদেহসংহিতা, নিমি সংহিতা, কাঙ্কায়নসংহিতা, গার্গ্যসংহিতা, গালবসংহিতা, সাত্যকিসংহিতা, শৌনকসংহিতা, করাল সংহিতা, চক্ষুষ্যসংহিতা ও কৃষ্ণাত্রেয়সংহিতা, (অন্ততঃ ১০ খানি)।

৩। কায় চিকিৎসায়—অগ্নিবেশ সংহিতা, ভেল সংহিতা, জতুকর্ণ সংহিতা, পরাশর সংহিতা, ক্ষারপাণি সংহিতা, হারীতসংহিতা, খরনাদ সংহিতা, বিশ্বামিত্র সংহিতা, কপিলসংহিতা, গোতম সংহিতা, (অন্ততঃ ১০ খানি)

৪। ভূতবিদ্যায়—অথর্ব্ব সংহিতা (অথর্ব্ববেদ নহে) প্রভৃতি কয়েক খানি সংহিতা এককালে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। চরক এই অঙ্গকে মানস রোগাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

৫। কৌমার ভৃত্যতন্ত্রে—হিরণ্যাক্ষসংহিতা, জীবকতন্ত্র, পার্ব্বতকতন্ত্র, ও বন্ধকতন্ত্র (অন্ততঃ ৪ খানি)

৬। অগদতন্ত্রে—কাশ্যপসংহিতা, অলম্বায়নসংহিতা, উশনঃসংহিতা, সনকসংহিতা, লাট্যায়নসংহিতা, (অন্ততঃ ৫ খানি)

৭। রসায়নতন্ত্রে—পাতঞ্জলসংহিতা, ব্যাড়িসংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা, মাণ্ডব্যসংহিতা, নাগার্জ্জুনসংহিতা, (অন্ততঃ ৫ খানি)

৮। বাজীকরণ তন্ত্রে—কুচুমারতন্ত্র প্রভৃতি (বাৎস্যায়ন কামসূত্রে নির্দ্দিষ্ট)

এইরূপে ৪৫ খানি প্রাচীন সংহিতার পরিচয় মদীয় গ্রন্থের ভূমিকায় প্রমাণ প্রয়োগ সহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে ৪ খানি সংহিতার

ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ২ খানি প্রসিদ্ধ, ২ খানি অপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ ২ খানি—বর্ত্তমান চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা। চরক সংহিতা প্রাচীন অগ্নিবেশসংহিতার চরকমুনি কৃত সংক্ষিপ্তসার, উহারও শেষ তৃতীয়াংশ দৃঢ়বল নামক একজন কাশ্মীরী—পণ্ডিত কৃত। সুশ্রুত সংহিতা প্রাচীন বৃদ্ধসুশ্রুতের ভগ্নাবশেষ,—উহাই যে বৃদ্ধ সুশ্রুত নহে, সে সম্বন্ধে সুশ্রুতের মধ্যেই রাশি রাশি প্রমাণ আছে। মদীয় উপোদ্‌ঘাতে সেগুলি দ্রষ্টব্য। অপ্রসিদ্ধ নবাবিষ্কৃত সংহিতাদ্বয়ের নাম—ভেল সংহিতা ও কাশ্যপ সংহিতা। এই দুইখানি গ্রন্থই দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর লাইব্রেরীতে বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে প্রথম খানির অনুলিপি বিলাতের ডাক্তার বার্ণেল ও ডাক্তার হর্ণলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার" সম্পাদক আয়ুর্ব্বেদ-মার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য মহাশয় উভয় গ্রন্থেরই অনুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভেল সংহিতার অনুলিপি যাদবজীর কৃপায় আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু দেখিয়াছেন, কেহ কেহ সংগ্রহ ও করিয়াছেন। কাশ্যপসংহিতার অনুলিপি পূর্ণ হইলেই সম্ভবতঃ যাদবজী আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। এজন্য এই মহাত্মার উৎসাহ ও অন্বেষণ বিশেষ প্রশংসা যোগ্য।

হারীত সংহিতা নামে যে গ্রন্থ এখন কলিকাতায় ও বোম্বাই প্রদেশে পাওয়া যায়, উহা প্রাচীন হারীত সংহিতার কিছু কিছু অংশ লইয়া বিরচিত একখানি জাল গ্রন্থ। উহার রচনায় এত ব্যাকরণাশুদ্ধি, ছন্দঃপাত ও চপলতা আছে যে, উহা ঋষি প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। টীকাকারদের উদ্ধৃত হারীত সংহিতার অনেক পাঠ ও উহাতে আদৌ দেখা যায় না।

কালের প্রভাবে অতীত সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ ব্যাপী রাজ্যবিপ্লবে, শকজাতি, হুণজাতি, গ্রীকজাতি ও মুসলমান গণের ঘোর আক্রমণ জনিত গৃহাদাহাদিতে কত শত প্রাচীন গ্রন্থ রত্ন যে নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? তথাপি যদি এই ভগ্নাবশেষ আয়ুর্ব্বেদ লইয়া স্বীকার করিতে হয়—"যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নাস্তীহ ন তৎ ক্বচিৎ" তবে দেশের দুর্ভাগ্য আর আয়ুর্ব্বেদোপাসকগণের ঘোর বুদ্ধিবিভ্রম ভিন্ন আর কি বলিব?

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ শল্যতান্ত্রিকগণ সেকালে যে সকল শাস্ত্রোপচার করিতেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি বর্ত্তমান সময়ের উন্নতিশীল পাশ্চাত্য শস্ত্রচিকিৎসকগণের বড় ২ অপারেশনের সদৃশ। উদর বিদারণ, কাটা অস্ত্র যোড়া দেওয়া, কর্ত্তিত নাসিকার পুনর্নির্ম্মাণ, গর্ভের মধ্যে শিশুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করা, হস্ত পদাদি ছেদ—এ সকল অপারেশন তখন সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এখন ও সুশ্রুতে যে সকল বন্ধ বা ব্যাণ্ডেজিং এর উল্লেখ আছে, কয়জন কবিরাজ সে গুলি বুঝাইয়া দিতে সম্যক্ সমর্থ? ঐ সকল বন্ধের মধ্যে কতক গুলি যে ডাক্তারীর কৃপায় আজও বুঝা যাইতে পারে, উহা আমি প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি।

শব্দশাস্ত্রের দ্বার যেমন ব্যাকরণ, অর্থবোধের দ্বার যেরূপ তর্ক শাস্ত্র। চিকিৎসা শাস্ত্রেরদ্বার সেইরূপ শারীরশাস্ত্র। এই শারীরশাস্ত্র এককালে কেবল চিকিৎসকগণেরই শিক্ষণীয় ছিল—এরূপ নহে, বড় ২ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও এই শাস্ত্র সাদরে শিক্ষা করিতেন। এই জন্যই দেখিতে পাই ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্মণ, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পাতঞ্জলদর্শন, বিষ্ণুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, রুদ্রযামলতন্ত্র, শারদাতিলক প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই শারীরের কথা অল্পবিস্তর বর্ণিত আছে। ডাক্তার হর্ণলি আয়ুর্ব্বেদের শারীর বিচার সম্বন্ধে একখানি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে "শারীর পদ্মিনী" নামক একখানি প্রাচীন শারীরগ্রন্থের তিনি পরিচয় দিয়াছেন। বোধ হয়, বৃদ্ধসুশ্রুতসংহিতার শারীরশাস্ত্র সুবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত ছিল এবং সেই জন্যই "শারীরে সুশ্রুতঃ শ্রেষ্ঠঃ" এই প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান সুশ্রুত সংহিতার শারীর দেখিয়া জ্ঞাতশারীর ব্যক্তি মাত্রকে হতাশ হইতে হয়। তথাপি যে ভগ্নাবশেষ এখন ওবর্ত্তমান তাহা হইতে অনেক ইট কাঠ সংগ্রহ করা যায়। সুশ্রুত, চরক, বাগ্‌ভট এবং পূর্ব্বোক্ত বেদ পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে এইরূপ ইট কাঠ সংগ্রহ করিয়া বহু কষ্টে প্রত্যক্ষানুগত করিয়া আমি একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ "প্রত্যক্ষ শারীর" লিখিয়াছি। সম্ভবতঃ ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের একটা অবশ্য শিক্ষণীয় পূর্ব্বাঙ্গের কিঞ্চিৎ পূর্ত্তি হইবে।

কিন্তু আমাদের করণীয় অনেক। আয়ুর্ব্বেদকে পুনরায় পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমতঃ (১) সমগ্র ভারত জুড়িয়া আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসকগণের যথাসম্ভব একতা স্থাপন আবশ্যক। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আয়ুর্ব্বেদ কেবল বাঙ্গালার. বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বা মহারাষ্ট্রের বা মাদ্রাজের নহে, ইহা সকলেরই সম্পত্তি। আমরা সকলে একই দেবতার উপাসক, একই পথের পথিক। আমরা এক হইয়া কার্য্য করিলে দেশের নিকট ও রাজ শক্তির নিকট এক মহাশক্তি বলিয়া বিবেচিত হইব, নচেৎ কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসক সম্প্রদাই নহে দেশের যাবতীয় শিক্ষিত লোকেই আমাদিগকে চিরদিনই হেয় জ্ঞান করিবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাপ্রণালীরও আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা সাধারণতঃ দুই প্রণালীতে হইতে পারে. এক প্রণালী কলেজের ও হাঁসপাতালের শিক্ষা; দ্বিতীয় প্রণালী গুরুগৃহে বাস করিয়া শিক্ষা। উভয় প্রণালীতেই অনেক গুণ ও অনেক দোষ আছে; কিন্তু ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে হইলে ছাত্রের পক্ষে অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টাকাল প্রত্যহ উপদেশ পাওয়া আবশ্যক—এই হিসাবে কালেজের শিক্ষা প্রশস্ত। হাঁসপাতালে রোগী দেখার সুবিধাও অনেক,—গুরুগৃহে ঠিক সেরূপ সুবিধা কখনই হয় না। তথাপি গুরুগৃহে শিক্ষার গুণও অনেক—ইহাতে যেরূপ গুরুর উপদেশ ও চিকিৎসা প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা যায়, প্রথমোক্ত প্রণালীতে সেইরূপ শিক্ষার সুবিধা হয় না। সেই জন্যই দেখা যায়, অনেক সময়ে মেডিকেল কলেজে ৫।৬ বর্ষ পড়িয়া কৃতবিদ্য নূতন ডাক্তার যেরূপ চিকিৎসা করিতে পারেন না, একজন অল্পবিদ্য কবিরাজের কম্পাউণ্ডার বা ছাত্র, তদপেক্ষা ভাল চিকিৎসা (অন্ততঃ কোন ২ রোগের) করিতে পারে। বাস্তবিক হাতে কলমে চিকিৎসা করিয়া জ্ঞান লাভ না করিলে চিকিৎসকের চিকিৎসা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এইজন্য গুরুগৃহে শিক্ষার আবশ্যকতা অল্প নহে। আমার বোধ হয় কলেজে ও হাঁসপাতালে শিক্ষার প্রণালী কতকপরিমাণে যোগ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা গুরুগৃহেই ভালরূপে হইতে পারে। উভয় প্রণালীর সম্মিলন হইলে বাস্তবিকই মণিকাঞ্চন যোগ হইতে পারে। এইজন্য আদর্শ বিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রণালী ও আরোগ্যশালা স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা প্রণালী অনেকস্থলেই অতি শোচনীয়। ২।১ বৎসর সামান্য কিছু পড়িয়া বা না পড়িয়া ২।৪টী ঔষধ শিখিয়াই কতশত

কবিরাজের ছাত্র কবিরাজ হইতেছে, এই সকল কবিরাজের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের গৌরব কিরূপে রক্ষিত হইবে? এত অত্যাচারেও যে আয়ুর্ব্বেদ এখনও জীবিতাবস্থায় বর্ত্তমান, সে কেবল ইহার মহাপ্রাণতা বা অমরতার বলে। ঋষিদের জ্ঞান-জ্যোতির আকর এই আয়ুর্ব্বেদ সূর্য্য এখন আমাদের ভাগ্যদোষে ও বুদ্ধির দোষে হীনপ্রভ সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্র নক্ষত্রের জ্যোতিঃ আজও কতবার ইহার নিকট ম্লান হইয়া থাকে। ঈশ্বর করুন, এই সূর্য্য যেন কখনও অস্তমিত না হয়।

(৩) তৃতীয়তঃ, আয়ুর্ব্বেদকে পুনরায় পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদিগকে প্রচলিত গ্রন্থ সমূহের সংস্কার এবং বিলুপ্ত গ্রন্থ সমূহের উদ্ধার করিতে হইবে। প্রচলিত গ্রন্থ সমূহের দুর্দ্দশার কথা কোন্ গম্ভীরদর্শী না জানেন? একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। চরকসংহিতা আয়ুর্ব্বেদশারীর অবশ্য পাঠ্য বিশাল গ্রন্থ—ইহা অশেষ জ্ঞানের আকর। এই গ্রন্থ যিনি ছাত্রগণকে পড়াইয়াছেন, তিনিই জানেন ইহার পাঠ সম্বন্ধে পদে পদে কিরূপ গোলমাল,—কত লিপিকর প্রমাদ ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। সম্প্রতি চরকের ৬।৭ টী ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে,—অনেক পাঠ এমন আছে যে গুলি প্রত্যেক সংস্করণেই বিভিন্ন। কতস্থানে কতপংক্তি উল্টা পাল্টা হইয়া আছে, কতস্থানে কতপাঠ আদৌ দেখা যায় না। সুশ্রুতসংহিতাতেও যে এরূপ আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য—বিশেষতঃ সুশ্রুতের শারীর স্থানে। উহার অনেক দৃষ্টান্ত ও স্থানান্তরে দেখাইয়াছি এস্থানে সে গুলির উদ্ধার করিয়া—পুঁথি বাড়াইব না। বিলুপ্ত গ্রন্থ সমূহের পুনরুদ্ধার যে কতদূর আবশ্যক, পূর্ব্বোক্ত বিলুপ্ত সংহিতা গুলির তালিকা দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। দেশব্যাপী চেষ্টা হইলে হয়তো এখন ও অনেক গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পারে। আর যদি না ই পাওয়া যায়, তাহা হইলে ও নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে। চোরে একবার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে বলিয়া আর কি নূতন ধনার্জ্জন করিতে হইবে না? চরক বলিয়াছেন—

ভিষগ্ বুভূষুর্ম্মতিমানতঃ স্বগুণ সম্পদি।
পরং প্রযত্ন মাতিষ্ঠেৎ প্রাণদঃ স্যাদ্ যথা নৃণাম্॥

এখন এই "পর প্রযত্ন" করিবার সময় সকলের পক্ষেই উপস্থিত। ঋষি প্রণীত গ্রন্থ না পাওয়া গেলে নিজ ২ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়া শাস্ত্রের

বিকল অঙ্গ সমূহের পুনরায় পূর্ত্তি করিতে হইবে। বৃথা ঋষিভক্তিতে অন্ধ হইয়া কেবল অতীতের জন্য রোদন করিলে শাস্ত্রের উদ্ধার হইবে না। এইজন্য দেশে আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার জন্য উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র সমূহ, সভাসমিতি, প্রবন্ধ পাঠ, গ্রন্থাগারস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যও একান্ত আবশ্যক।

বাঙ্গালী হইতে আয়ুর্ব্বেদের এককালে প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। মাধব কর চক্রপাণি দত্ত, শিবদাস, অরুণ দত্ত প্রভৃতি অনেক বড় ২ আচার্য্য বাঙ্গালা দেশেই জন্মিয়াছিলেন, গঙ্গাধর আয়ুর্ব্বেদের টীকাদি রচনা করিয়া সেদিন ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন। এজন্য বাঙ্গালীর দায়িত্ব অন্যান্য জাতি অপেক্ষা এবিষয়ে অনেক অধিক। কিন্তু ভারতব্যাপী আন্দোলন ও আয়ুর্ব্বেদোন্নতির প্রযত্ন বর্ত্তমান সময়ের কয়জন বাঙ্গালী চিকিৎসক করিতেছেন? ভারতব্যাপী আয়োজন দূরে থাকুক, সর্ব্বদেশেই আয়ুর্ব্বেদের জন্য কতটুকু সমবেত চেষ্টা বাঙ্গালী বৈদ্যগণ করিতেছেন? বিশ বৎসরের অধিক হইল স্বর্গীয় চিকিৎসক চূড়ামণি কালীপ্রসন্ন সেন ও গঙ্গাপ্রসাদ সেন এবং মদীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় কবিরাজ বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ সভা ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে চেষ্টা কোন ফলবতী হয় নাই। পরে অনেকবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। ৮।৯ বর্ষ পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল্ এম্ এস মহাশয় একবার কবিরাজ মহাশয়দের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন ও সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, সহানুভূতির অভাবে ঐকার্য্যও তিনি স্থায়ী করিতে পারেন নাই। পরে বহুকষ্টে স্বর্গীয় চিকিৎসক প্রবর মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন প্রমুখ চিকিৎসক-গণের চেষ্টায় এই আয়ুর্ব্বেদ সভা স্থাপিত হইয়াছে, উহার উপরে ও কত ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ভগবানের কৃপায় শত বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উহা এখনও জীবিত। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে বৈদ্য চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক আরও একটী আয়ুর্ব্বেদ সভা স্থাপিত হইয়াছিল, সুখের বিষয় উহা এখন পুনরুজ্জীবিত ও উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর। বঙ্গদেশে "ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদ সভা" নামে আরও একটী আয়ুর্ব্বেদ সভা বর্ত্তমান, এই সভাদ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে কার্য্য হইতেছে। পরস্পর মিলিত হইয়া সভ্যগণ যদি এই সকল সভাকে একত্র ও মনের মত করিয়া তুলিতেন, তবে এই সকল সভাদ্বারা কতকার্য্য হইত! (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদে তামাকু ও ধূমপান !

আমরা এই প্রস্তাবে সাধারণে বিশেষ প্রচলিত "তামাকু ও ধূমপান" সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের অভিমত কি, তাহা প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যখন মুসলমান রাজত্বে জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে "তামাকু" দেশান্তর হইতে সর্ব্বপ্রথমে এ দেশে সমানীত হইয়াছিল, তখন আর তাহার কথা আয়ুর্ব্বেদে কি প্রকারে থাকিতে পারে?

ইহা সত্য যে, চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি সুপ্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, অথবা তদপেক্ষা পরবর্ত্তীকালের হইলেও প্রাচীন বাগ্‌ভটপ্রণীত প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতায় তামাকুর কোনই উল্লেখ নাই। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের বাগ্‌ভট সিন্ধুদেশে জন্মিয়াছিলেন, উল্লেখ আছে। লোক প্রসিদ্ধি—বাগ্‌ভট পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময়ে তাঁহারই পারিবারিক চিকিৎসকরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। এইরূপ হইলে বাগ্‌ভট পাঁচহাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, বলা যাইতে পারে। কিন্তু আধুনিক মতে, বাগ্‌ভট বৌদ্ধ ছিলেন, অতএব তিনি বুদ্ধদেবের পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাতে বাগ্‌ভট অপেক্ষাকৃত অনেক পরবর্ত্তী সময়ের ব্যক্তি হইয়া পড়েন। তাহাতেও তিনি দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বকার লোক নিশ্চয়ই হইবেন, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময় হইতে সহস্রবৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী চক্রপাণিদত্তকৃত চিকিৎসা সংগ্রহ ও দ্রব্যগুণ প্রভৃতি গ্রন্থেও তামাকুর কোনরূপ নির্দ্দেশ নাই। এতদপেক্ষা নূতনগ্রন্থ ভাবমিশ্র প্রণীত ভাবপ্রকাশে "খুরাসানী" বা "পারসীক"* যবানী (জোয়াইন), "খুরাসানী" বা "পারসীক" বচা (বচ), "অমৃতফলং" যদ্ বদকসান কাবিল প্রভৃতিষু দেশেষু নাসপাতি ইতি প্রসিদ্ধং" (বদকসান ও কাবুল প্রভৃতি দেশে জাত নাসপাতিকে গ্রন্থকার "অমৃতফল" নামে উল্লেখ করিয়াছেন,) এবং "কুণ্ডলিনী, জিলেবী ইতি লোকে" প্রভৃতির সমুল্লেখ থাকিলেও তামাকুর কোন কথাই নাই।

অমরা "যোগরত্নাকর" নামক গ্রন্থে এই তামাকুর সবিশেষ উল্লেখ পাইয়াছি। এই গ্রন্থখানি দক্ষিণ ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র প্রদেশে আমাদের এই

* চক্রদত্তকৃত চিকিৎসাগ্রন্থে "পারসীয় যবানীর" উল্লেখ আছে।

বঙ্গদেশীয় চিকিৎসক সমাজে চক্রপাণি দত্তকৃত (যাহা গ্রন্থকারের নাম অনু- সারে "চক্রদত্ত" বলিয়াই প্রসিদ্ধ) চিকিৎসাগ্রন্থের ন্যায় বিশেষরূপে সমাদৃত। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার ইহাতে নিজের কোন পরিচয়ই প্রদান করেন নাই, তথাপি তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ "যোগরত্নাকর" তাঁহাকে অন্তরাল হইতেও জননয়নের সম্মুখীন করিয়া রাখিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা যোগ রত্নাকর গ্রন্থে, সুশ্রুত, বৃন্দ, চিকিৎসাসাগর, যোগ তরঙ্গিণী, শার্ঙ্গধর, রসরত্নপ্রদীপ, চন্দ্রসেন, বঙ্গসেন যোগসার, ভাবপ্রকাশ ও বৈদ্যবিলাস প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থও গ্রন্থকারগণের উল্লেখ পাইয়াছি, সুতরাং ঐ সকলের পরবর্ত্তীকালে যে "যোগরত্নাকর" রচিত হইয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভাবমিশ্র, স্বপ্রণীত ভাব প্রকাশে বৈদ্য মাধবকর প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রুগবিনিশ্চয়ের (নিদানের) টীকা—মহামহোপাধ্যায় বৈদ্য বিজয়রক্ষিতকৃত "মধুকোষের" উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আবার বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় বিজয় রক্ষিতকৃত নিদান টীকা "মধুকোষে" চক্রপাণির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব মাধবকর ও চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত, ভাবমিশ্র যোগরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থকারের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

চক্রপাণি দত্ত নিজ গ্রন্থে এইরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন—

"গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারি পাত্রনারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিতলোধ্রবলীকুলীনঃ শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী॥"

চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণ গৌড়দেশাধিপতি নরপালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ অর্থাৎ ভোজ্যদ্রব্যপরীক্ষক ও মন্ত্রী ছিলেন। চক্রপাণির জ্যেষ্ঠ সহোদর ভানু "অন্তরঙ্গ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন (বিদ্যা ও কুলসম্পন্ন চিকিৎসকেরই রাজদত্ত উপাধি "অন্তরঙ্গ"।) চক্রপাণি, সুনীতিসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ লোধ্রবলী সংজ্ঞক দত্তকুলোৎপন্ন ছিলেন। চক্রদত্তকৃত গ্রন্থের টীকাকার শিবদাস সেন, "গৌড়াধিনাথ" শব্দে এ স্থলে নরপালদেবকেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শিবদাস সেন একজন প্রামাণিক ও প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকার। ইহার প্রণীত চক্রদত্ত গ্রন্থের টীকা "তত্ত্বচন্দ্রিকা" চিকিৎসকসমাজে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক সুধীগণ জ্ঞাত আছেন, পালবংশীয় নৃপতিগণ সেনবংশীয় রাজাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। আবার সেনবংশীয় রাজাদের চরমাবস্থাতেই এই দেশ মুসলমান ভূপতিদিগের করায়ত্ত হইয়াছিল। ভাবমিশ্র প্রণীত ভাব প্রকাশে 'মুনাক্কা" "নাসপাতি" "তোপচিনী" "পারসিক", "কারিল" ও "বদকসান" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিয়া, ইহা যে মুসলমান অধিকার সময়ে রচিত, তাহা নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হয়। আবার ফিরঙ্গরোগের উল্লেখ থাকাতে, উহা যে পর্ত্তুগীজগণের এদেশে আগমনের পরে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত তাহারও প্রতীতি হয়, অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। এ দিকে যোগরত্নাকর গ্রন্থে ভাব প্রকাশের প্রমাণ উল্লিখিত থাকায় যোগরত্নাকর যে ভাব প্রকাশের পর রচিত, তাহা নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হইল।

আমরা যোগরত্নাকরে তামাকুর বিষয় এইরূপ দেখিতেছি—

"অথ তমাখুগুণাঃ।

ধূমাখ্যো ধূমবৃক্ষশ্চ বৃহৎপত্রশ্চ ধূসরঃ।
তমাকু গুচ্ছফলকো ধূমযন্ত্রপ্রকাশকঃ॥
বহুবীজো বহুফলঃ সূক্ষ্মবীজস্তু দীর্ঘকঃ।
দীর্ঘং পাটলবর্ণঞ্চ পুষ্পং তস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥
তস্য পত্রন্তু তীক্ষ্ণোষ্ণং কফবাতহরং পরম্।
শ্বাসকাসহরঞ্চৈব কোষ্ঠবাত হরস্তথা॥
বাতানুলোমনকরং বস্তিশোধন মুত্তমম্।
দন্তরুক্‌শমনঞ্চৈব ক্রিমিকণ্ড্বাদিনাশনম্॥
মদপিত্তভ্রমকরং বমনং রেচনং স্মৃতম্।
দৃষ্টিমান্দ্যকরঞ্চৈব তীক্ষ্ণশুক্রকরস্তথা॥
তস্যৈব ধূমপানন্তু বিশোষাদ্ধৃদি শুক্রহৃৎ।
দেশান্তর প্রভেদেন তীক্ষ্ণং চার্ত্তবপিত্তলম্॥
বমনস্য প্রভাবেণ বৃশ্চিকাদি বিষং হরেৎ।
রেচনত্বাদ্ধরেদ্বাতং শ্লেষ্মাণঞ্চ নিযচ্ছতি॥

"অনন্তর "তমাখুর" গুণ কথিত হইয়াছে। ধূমাখ্য, ধূমবৃক্ষ, বৃহৎপত্র ধূসর, তমাখু, গুচ্ছফলক, ধূমযন্ত্রপ্রকাশক, বহুবীজ, বহুফল সূক্ষ্মবীজ ও দীর্ঘক, এইগুলি তমাখুরই পর্য্যায় শব্দ (বিভিন্ন নাম)। তমাখুর ফুল দীর্ঘ

ও পাটলবর্ণ হইয়া থাকে। তমাখুর পাতা তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য। তমাখু কফ, বাত, শ্বাস, কাস, কোষ্ঠাশ্রিতবাত, দন্তশূল, ক্রিমি ও কণ্ডূ (চুলকণা) প্রভৃতি রোগ বিনাশক। তমাখু বায়ুর অনুলোমনকারক ও বস্তি (মূত্রাশয়) শোধক। *তমাখু সেবনে বমি, ভ্রম ও মত্ততা জন্মিয়া থাকে এবং পিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তমাখু রেচক ও দৃষ্টিমান্দ্যকারক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও শুক্রজনক বলিয়া কথিত। তমাখুর ধূমপানাধিক্যে, হৃৎপীড়া ও শুক্রহানি হইয়া থাকে। দেশান্তরজাত (কোন্ দেশ ?) তমাখু, অতিশয় তীক্ষ্ণবীর্য্য, আর্ত্তব ও পিত্ত বৃদ্ধিকারক। তমাখু প্রয়োগদ্বারা বমন করাইলে বৃশ্চিকাদির বিষ দূরীভূত হয়। তমাখুর বিরেচকশক্তি আছে, এইজন্য ইহাদ্বারা বায়ু ও কফের নাশ হইয়া থাকে।"

তামাকু, বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বদেশেই ভদ্রতার পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অধুনা তামাকু সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, অনেকে তৎপ্রতি অনুকূল ত নহেনই অধিকন্তু ইহার প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদবিদ্ মহর্ষিগণ বলিয়া গিয়াছেন এমন কোন্ পদার্থই বর্ত্তমান নাই যাহা হইতে স্থলবিশেষে প্রাণীদিগের মঙ্গল সাধিত না হইয়া থাকে। বৈদ্যক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্ ॥"

অন্ন, প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ হইলেও অবস্থাবিশেষ সেই অন্নও প্রাণ হন্তা হয়। আবার বিষ, প্রাণনাশক হইলেও সময়ে তদ্দ্বারাই প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে।

যোগরত্নাকর হইতে তামাকুর যে সকল গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে আবার দেখিতে পাইতেছি যে এক দিকে তামাকু কফ ও বায়ু নাশক, অন্যপক্ষে তামাকু পিত্ত ও রক্তের প্রকোপকারক। এই জন্যই আমরা সামান্যতঃ এইরূপ বুঝিতেছি, যাঁহারা বায়ু বা কফ প্রকৃতিবিশিষ্ট, তাঁহাদেরই তামাকু ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অন্যপক্ষে যাঁহারা পিত্তপ্রকৃতিক বা যাঁহাদের শরীরে রক্তজ বিকার বর্ত্তমান আছে তাঁহাদের তামাকু ব্যবহার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। স্থূলতঃ যাহাদিগের প্রতীতি আছে যে তাঁহাদিগের "ধাতু-রুক্ষ", তাঁহারা সর্ব্বতোভাবেই তামাকুকে পরিবর্জ্জন করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে বায়ু, রুক্ষ ও শীতগুণবিশিষ্ট, তামাকু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণ যুক্ত, এইজন্য তামাকু, শীতগুণবিশিষ্ট, বায়ুর শান্তি করিয়া থাকে। কিন্তু বায়ুর রুক্ষগুণ বর্ত্তমান থাকাতে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণ বিশিষ্ট তামাকু, বায়ু প্রকৃতিক মানবের পক্ষে অধিক ব্যবহার করা বিহিত নহে। কারণ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণদ্রব্যের অত্যধিক ব্যবহার নিবন্ধন বায়ু সহজেই প্রকুপিত হইয়া নানা পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। বায়ুর রুক্ষ ও শীত এই উভয় গুণ থাকাতে পিত্তের বা কফের বিনাশক বা প্রবর্দ্ধক কোন দ্রব্যই বায়ুকে অধিকক্ষণ স্বপ্রকৃতিতে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, সহজেই বায়ুর প্রকোপ হইয়া পড়ে। বায়ুর এইরূপ গুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"যোগবাহী পরং বায়ুঃ সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ।
দাহকৃত্তেজসা যুক্তঃ শীতকৃচ্ছ্লেষ্মণাবৃতঃ।"

বায়ু যোগবাহী, সুতরাং যথাক্রমে পিত্ত ও কফের সংস্রবে শরীরের সন্তাপ বা শৈত্য উভয় ক্রিয়াই জন্মাইয়া থাকে।

উপরে যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা আমরা দেখাইতে প্রয়াস পাইলাম, যাঁহাদের শরীরে বায়ুর প্রাধান্য আছে, তাঁহাদের পক্ষে তামাকু অধিক ব্যবহার করা সঙ্গত নহে।

তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণ পিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সুতরাং উক্ত গুণবিশিষ্ট তামাকু পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই অব্যবহার্য্য। পিত্তের প্রকোপক বস্তু হইতে সাধারণতঃ রক্তেরও বিকৃতি জন্মিয়া থাকে, সুতরাং শরীরে রক্তবিকৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও তামাকু সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

গুরু, শীত ও স্নিগ্ধ গুণ, কফের ধর্ম্ম, সুতরাং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণ বিশিষ্ট তামাকু কফপ্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষেই প্রকৃত পক্ষে কল্যাণদায়ক।

আমরা আয়ুর্ব্বেদ হইতে ধূমপানের উপযোগবিধি এস্থলে সংক্ষেপে সমুদ্ধৃত করিতেছি—

"গৌরবং শিরসঃশূলং পীনসার্দ্ধাবভেদকৌ।
কর্ণাক্ষিশূলং কাসশ্চ হিক্কাশ্বাসৌ গলগ্রহঃ॥
দন্তদৌর্ব্বল্য মাস্রাবঃ স্রোতোঘ্রাণাক্ষি দোষজঃ॥

পূতিঘ্রাণাস্যগন্ধশ্চ দন্তশূলমরোচকঃ ॥
হনুমন্যাগ্রহঃ কণ্ডূঃ ক্রিময়ঃ পাণ্ডুতা মুখে।
শ্লেষ্মা প্রসেকো বৈস্বর্য্যং গলশুণ্ড্যুপজিহ্বিকা ॥
খালিত্যং পিঞ্জরত্বঞ্চ কেশানাং পতনং তথা।
ক্ষবথুশ্চাতিতন্দ্রা চ বুদ্ধের্মোহোঽতিনিদ্রতা ॥
ধূমপানাৎ প্রশাম্যন্তি বলং ভবতি চাধিকম্।
শিরোরুহ কপালানামিন্দ্রিয়ানাং স্বরস্য চ ॥
ন চ বাতকফাত্মানো বলিনোঽপ্যূর্দ্ধজত্রুজাঃ।
ধূমবক্ত্রক পানস্য ব্যাধয়ঃ স্যুঃ শিরোগতাঃ ॥”

চরক বলেন, শিরোগুরুত্ব, শিরঃশূল, পীনস (নাসারোগ), অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে মাথাধরা), অক্ষি ও কর্ণশূল, কাস, হিক্কা, শ্বাস, গলগ্রহ, দন্তশিথিলতা, দন্তশূল, নাসা বা চক্ষু হইতে জলনির্গমন, পূতিনাসা, মুখ দৌর্গন্ধ্য, অরুচি, হনু ও মন্যাগ্রহ, কণ্ডূ, ক্রিমি, মুখপাণ্ডুতা, কফনির্গমন, স্বরভঙ্গ, গলশুণ্ডি (গলরোগ) উপজিহ্বিকা, (জিহ্বারোগ), টাকপরা, চুল পিঙ্গলবর্ণ হওয়া' চুল উঠে যাওয়া, হাঁচি, তন্দ্রা, বুদ্ধিমোহ ও অতিনিদ্রা রোগ, ধূমপানদ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। ধূমপানদ্বারা কেশ, কপালাস্থি, স্বর ও ইন্দ্রিয় সমূহের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উর্দ্ধজত্রুজ শিরোগত বাত ও কফাত্মক বলবান ব্যাধিসমূহ, কেবলমাত্র ধূমপানের অভ্যাস বশতঃই জন্মিতে পারে না।

রেণুকা, প্রিয়ঙ্গু, কৃষ্ণজীরা, নাগকেশর, নখী, বালা, রক্তচন্দন, তেজপাতা এলাচি, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, জটামাংসী, গুগ্‌গুল, অগুরু, চিনি যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, পাকুর ও লোধ্র, প্রভৃতি দ্রব্য সমভাগে লইয়া সুপেষণ পূর্ব্বক মধ্যদেশে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলবৎ স্থূল আট আঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ বর্ত্তী প্রস্তুত করিতে হইবে। যেরূপ যবের মধ্যভাগ স্থূল ও উভয়প্রান্ত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, ধূমবর্ত্তীও ঠিক সেইরূপ মধ্যে স্থূল ও উভয় প্রান্ত অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে ঐ বর্ত্তী প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, যেন উহার মধ্যে ছিদ্র বর্ত্তমান থাকে। শুষ্ক করার পরে এই বর্ত্তিতে ঘৃত ও মোম মাখিয়া রাখিতে হইবে। যথাকালে নেত্র অর্থাৎ পাইপ সংযোগে ঐ বর্ত্তির ধূম পান করিতে হইবে। দেখা যাইতেছে, এই বর্ত্তী ঠিক বর্ত্তমান কালের চুরুটেরই অনুরূপ।

নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহে ধূমপান করা নিষিদ্ধ ;—

" ন বিরিক্তঃ পিবেদ্ধূমং ন কৃতে বস্তিকর্ম্মণি।
ন রক্তী ন বিষেণার্ত্তো ন শোচী ন চ গর্ভিণী॥
ন শ্রমে ন মদে নামে ন পিত্তে ন প্রজাগরে।
ন মূর্চ্ছাভ্রমতৃষ্ণাসু ন ক্ষীণে নাপি চ ক্ষতে॥
ন মদ্যদুগ্ধে পীত্বা চ ন স্নেহং ন চ মাক্ষিকংস!
ধূমং ন ভুক্ত্বাদধ্না চ ন রুক্ষঃ ক্রুদ্ধ এবচ।
ন তালুশোষে তিমিরে শিরস্যভিহতে ন চ।
ন শঙ্খকে ন রোহিণ্যাং ন মেহে ন মদাত্যয়ে॥
এষু ধূমমকালেষু মোহাৎ পিবতি যো নরঃ।
রোগাস্তস্য প্রবর্দ্ধন্তে দারুণা ধূমবিভ্রমাৎ॥
তালুমূর্দ্ধা চ কণ্ঠশ্চ শুষ্যতে পরিতপ্যতে।
তৃষ্যতে মুহ্যতে জন্তু রক্তঞ্চ স্রবতে২ধিকং॥
শিরশ্চ ভ্রমতে২ত্যর্থং মূর্চ্ছা চাস্যোপজায়তে।
ইন্দ্রিয়াণ্যুপতপ্যন্তে ধূমে২ত্যর্থনিষেবিতে॥"

বিরেচন ও বস্তিকর্ম্মের (পিচকারি দেওয়ার) পরে ; যাহাদিগের শরীরে কোন প্রকার রক্ত বা পিত্তের বিকৃতি অথবা বিষের সংস্পর্শ ঘটিয়াছে ; শোকার্ত্ত ব্যক্তি, গর্ভিণী স্ত্রীলোক, পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, মদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষত ও ক্ষীণ (রাজযক্ষ্মা), তালুশোষ, তিমির (চক্ষুরোগ), প্রমেহ, মদাত্যয় (অতিমদ্যপানজাত বিকার) ও মস্তকে অভিঘাত প্রাপ্ত হইলে ; মদ্য, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য ও মধুপান করিবার পরে ; এবং রুক্ষ ও ক্রোধের অবস্থায়, ধূম পানকরা একেবারেই নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ অবস্থাতে এবং ধূমপানের যে সময় নির্দ্ধারিত আছে, তদ্ব্যতীত অন্যকালে ধূমপান করিলে, ধূমের বিরুদ্ধপান নিবন্ধন নানাপ্রকার কষ্টদায়ক ব্যাধি জন্মিয়া থাকে।

ধূমপানের আতিশয্যে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মোহ, শিরোভ্রম, ও অতিশয় রক্তস্রাব হয় এবং সকল ইন্দ্রিয়েরই অত্যধিক সন্তাপ জন্মিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে বাত ও কফপ্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ

বিনাশের জন্য প্রধানতঃ নিদ্রা, মুখপ্রক্ষালন, স্নান ও আহার প্রভৃতির পরে ধূমপান প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অনেকে মুখদ্বারা ধূমপান করিয়া নাসাপথে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে, ইহাতে চক্ষুর বড়ই অনিষ্টের সম্ভাবনা। চরক বলেন—

"আস্যেন ধূমকবলান্ পিবন্ ঘ্রাণেন নোদ্বমেৎ।
প্রতিলোমং গতো হ্যাশু ধূমোহিংস্যাদ্ধি চক্ষুষী॥

আয়ুর্ব্বেদ মতে ধূমপান করিবার নেত্র অর্থাৎ পাইপ বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে ২৪ অথবা ৩৫ অঙ্গুলি প্রমাণ হওয়া আবশ্যক। এই ধূমপান-নেত্র তিন পর্ব্বে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, কারণ এইপ্রকার পর্ব্বত্রয়ে বিভক্ত হইলে ধূমের প্রখরতা অনুভূত হয় না এবং ধূমও অপেক্ষাকৃত মৃদুত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে নেত্র অর্থাৎ পাইপের যতটা পরিমাণ ও উহাতে যেরূপ পর্ব্ব ছিন্ন করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, বর্ত্তমান সময়ে হুকা সহযোগে ও 'চুরুট' রূপে তামাকুর যে দুই প্রকার ধূমপানের বিধান পরিলক্ষিত হইতেছে, এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রকারই প্রশস্ততর। কারণ হুকায় তামাকু সেবন করিলে, ইহার তীব্রতা অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু চুরুটের দ্বারা উহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমানে কর্ম্মক্ষেত্রে লোকের সময়ের যেরূপ অল্পতা ঘটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে হুকার অনাদরের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে চুরুটের ব্যবহারই অধিক দেখা যাইতেছে।

গুড়ুক ও চুরুট ব্যতীত তামাকু সেবনের অন্য এক প্রকার ভেদ আছে। এদেশের অনেক স্ত্রীলোক শুদ্ধ অথবা পানের সহিত তামাকুপাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণই ইহা বাহুল্যরূপে ব্যবহার করে। কোন কোন পুরুষও রোগ নিবারণ ব্যপদেশে এইরূপ করিয়া থাকে। স্থল-বিশেষে ইহা দ্বারা উপকার হইতেও দেখা যায়। তবে মোটের উপরে বহুস্থলে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য দূরে প্রস্থান করায় অভ্যাস মাত্রে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীরা চূণের সহিত তামাকু পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাও অভ্যাস মাত্রেই এখন পরিগণিত হইয়াছে।

এতদ্দেশের পণ্ডিত সমাজে তামাকু "নস্য" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে উদ্দেশ্যে ধূমপানের বিধিবিহিত হইয়াছে, নস্য ব্যবহারের অভিপ্রায়ও তদপেক্ষা বিভিন্ন নহে। যাঁহারা ধূমপান না করিয়া নস্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধূমপায়ীদিগকে উপহাস করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে একই হুকাতে ধূমপান করা নিবন্ধন সংক্রামক রোগ বিভিন্ন শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তামাকুর তীব্রতম বিষ, ধূমপান অপেক্ষা নস্য প্রয়োগ দ্বারাই যে অধিক পরিমাণে নরদেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর কোনও সন্দেহই নাই।

বাদশাহী আমলের বস্তু হইয়াও আত্মপ্রভাবে তামাকু ব্রহ্মার দরবারে আত্মচরিত্র প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কাজেই লোকপিতামহ ব্রহ্মার অখণ্ড আদেশ শুনাইয়া আমরা তামাকু প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বে বর্ণাশ্রমা নরাঃ।
নিরয়েষু পতিষ্যন্তি তমাকু-কলিরূপতঃ॥
উপাসন্তে তমাকুং বৈ কলৌ নারদ যে নরাঃ।
ক্ষীণপুণ্যা পতিষ্যন্তি মহারৌরবসংজ্ঞকে॥
অভক্ষ্যভক্ষণাৎ পাপমগম্যাগমনাচ্চ যৎ।
মদ্যপানাচ্চ যৎ পাপং তমাকুপান-মাত্রতঃ॥
স্নাতা যে সর্ব্বতীর্থেষু প্রয়াগাদিষু কোটিশঃ।
বৃথৈব তানি সর্ব্বাণি তমাকুপান-মাত্রতঃ॥
পীতা যেন তমাকুর্বৈ নরেণ মুনি-নারদ।
কৃতং তেন ন সন্দেহঃ স্বজন্ম ম্লেচ্ছসংভবম্॥
ব্রতানি নিয়মা সর্ব্বে দানানি চ মহামুনে।
বৃথৈব তানি সর্ব্বাণি তমাকুপান-মাত্রতঃ॥

কিঞ্চ যোগেন জ্ঞানেন দেবেন পিতৃদৈবতৈঃ।
কিঞ্চ চিহ্নেন মৌনেন তমাকুং চেৎ পিবেন্নরঃ॥
সন্ন্যাসেন চ কিং তস্য বৈরাগ্যেণ চ কিং পুনঃ।
পীতা যেন তমাকুর্বৈ শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥
ব্রহ্মচর্য্যেণ কিং তস্য গার্হস্থ্যেনাপি কিং পুনঃ।
বানপ্রস্থেন কিং তস্য সন্ন্যাসেনাপি কিং পুনঃ॥
যস্তু তমাকুং পিবতি স্বাশ্রমান্নিরয়ে পতেৎ।
নারদাত্র ন সন্দেহঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ মুনিসত্তম।
শ্বপচৈঃ সদৃশা জ্ঞেয়াস্তমাকুপান-মাত্রতঃ॥
গৃহস্থা নৈব তে বিপ্রা নৈব তে ব্রহ্মচারিণঃ।
বানপ্রস্থা ন তে জ্ঞেয়া যতয়ো ন ভবন্তি হি॥
ধর্ম্মভ্রষ্টা হি তে জ্ঞেয়াস্তমাকুপান-মাত্রতঃ
পতন্তি নরকে ঘোরে রৌরবে নাত্র সংশয়ঃ॥
তমাকু-ভঙ্গ-মদ্যানি যে পিবন্তি নরাধমাঃ।
তেষাং হি নরকে ঘোরে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
ধিগ্ ধিক্ তেষাং ব্রতং পুণ্যং ধিগ্ জাতিং জন্ম কর্ম্মচ।
তমাকু ভঙ্গ-মদ্যানি যে পিবন্তি নরাধমাঃ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের তামাকু প্রস্তাবের পরিসমাপ্তি হইল।

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

(প্রভাত হইতে)

আয়ুর্ব্বেদে বসন্ত রোগের কথা।

(২)

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সকল রোগের নাম ও লক্ষণ আছে ও যে সকল রোগ এদেশে সচরাচর হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বসন্ত রোগের মত সংক্রামক রোগ আর একটিও দেখা যায় না। শাস্ত্র-মত যাহাই হউক, লোকের

মনে এরূপই ধারণা। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রোগ মাত্রই সংক্রামক, আবার কোন কোন ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বসন্ত কলেরা প্রভৃতি রোগও সংক্রামক নহে। যে হেতু তাঁহারাও পরীক্ষা দ্বারাই ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যা'ক এ বিষয়ও যথা সময় আলোচনা করা আবশ্যক হইবে। এখন দেখিতে হইবে আয়ুর্ব্বেদ ইহার সংক্রামকতা বিষয়ে কি বলেন। চরক অনেক বিষয়েই উদাসীন ছিলেন, সুতরাং এ বিষয়টিও তাঁহার আমলে আসে নাই। সুশ্রুত বলেন—

"প্রসঙ্গাদ্ গাত্র সংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্র মাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥"

সুশ্রুত কুষ্ঠ রোগাধিকারে এই যে সংক্রামক ঔপসর্গিক রোগের কথা বলিলেন, সেই রোগটি কি? ইহাই কি হারীতোক্ত উপসর্গ রোগ? অথচ অন্য কোন মূলগ্রন্থে ইহা ধরা হয় নাই। মাধব কর তাঁহার রুগ্‌বিনিশ্চয় নামক সংগ্রহ গ্রন্থে উপর্যুক্ত শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের বিজয় রক্ষিত প্রণীত ব্যাখ্যামধুকোষ নামক টীকায় তিনি—"ঔপসর্গিকাঃ রোগাঃ পাপরোগাদয়ো ভূতোপসর্গজাঃ সংক্রামন্তি আবিশন্তি" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বসন্ত রোগটি যে পাপরোগ বিশেষ তাহা প্রায় অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন।

বসন্ত জাতীয় বিস্ফোট নামে একটি রোগের অধিকার মাধব কর স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশকার উহা কুষ্ঠ মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শার্ঙ্গধরের মতেও উহা কুষ্ঠ মধ্যেই গণ্য। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে অনেক রোগ এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাও বেশ বুঝা যায় যে, কতকগুলি রোগ এক জাতীয়, উহার চিকিৎসাও অনেকটা অনুরূপ; কেবল দোষ, দূষ্য ও লক্ষণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ। আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ সকল আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও বসন্ত এই কয়টি রোগ একজাতীয়, ইহা স্মরণ করিয়াই হয়ত চরক আর বসন্ত বিস্ফোটের স্বতন্ত্র উল্লেখ না করিয়া কুষ্ঠ ও বিসর্পের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও বসন্ত ইহাদের আবার বহু শাখা প্রশাখা আছে, যেমন কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার, বিসর্প নয় প্রকার, বিস্ফোট আট প্রকার ও বসন্ত বা মসূরিকা চৌদ্দ প্রকার ইত্যাদি। ইহাদের নাম ও লক্ষণ 'মসাইয়' দেখিলে বড়ই বিশৃঙ্খল বোধ হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু চরকের রীতি অনুসরণ করিয়া রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা অত সমস্যায় পতিত হই না। তবে চরকের জ্ঞান বড় গভীর, উহা আয়ত্ত করা কিছু শক্ত। চরকের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের বিকাশই অন্যান্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। যাক্, আমরা এ সকল অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা অধিক না করিয়া বসন্ত রোগের নিদান ও লক্ষণাদি বিষয়ে এখন কিছু আলোচনা করিব।

চরকে মসূরিকা বা বসন্ত নামে কোন রোগের নিদান, লক্ষণ বা চিকিৎসা প্রভৃতির কিছুই উল্লেখ নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুশ্রুত ক্ষুদ্র রোগের নিদান মধ্যে বলিয়াছেন :—

"দাহ জ্বর রুজাবন্তস্তাম্রাঃ স্ফোটাঃ সপীতকাঃ।
গাত্রেষু বদনে চান্তর্বিজ্ঞেয়াস্তা মসূরিকাঃ॥"

যে রোগে জ্বর, দাহ ও বেদনার সহিত সমস্ত শরীরে, মুখে ও অভ্যন্তরে তাম্রবর্ণ বা পীতবর্ণ যে সকল স্ফোট উৎপন্ন হয় তাহার নাম মসূরিকা। এই গেল সুশ্রুতের কথা। হারীত বিসর্প বলিবার পর উপসর্গরোগে বলিতেছেন—

"চতুর্ব্বিধো ভবেদ্দোষো বাতরক্ত সমুদ্ভবঃ।
গন্ধ দোষেণ জায়ন্তে নামান্যেষাং পৃথক্ পৃথক্।
ক্ষুদ্রতশ্চান্তকো ঘোর অথবান্যা মসূরিকা।
বসন্তঃ সর্ষপাকারা পীড়কা যস্য দৃশ্যতে।
সোঽপি ক্ষুদ্রতরঃ প্রোক্তঃ পিত্তরক্ত প্রদোষতঃ।
অগ্নিদাহ ইবাসহ্যা পীড়কা যস্য দৃশ্যতে।
সোঽপ্যতীব বিসর্পীস্যাদসুখীব নিরন্তরম্।
সঘনা পীড়কা যস্য পাকমেতি সমঃ কফঃ।
দাহোঽরতির্ব্বিবর্ণত্বং তস্য সদ্যঃ প্রজায়তে।
বর্ত্তুলা মসূরিকা বৎ পীড়কা যস্য দৃশ্যতে।
নাম্যাতি শীঘ্র পাকেন সা বিজ্ঞেয়া মসূরিকা॥"

বাতরক্ত ও গন্ধদোষ বশতঃ উপসর্গ রোগ চারি প্রকার উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম ক্ষুদ্রতর, অন্তক, মসূরিকা ও বসন্ত। পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইয়া সর্ষপের মত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা জন্মে, তাহাকে ক্ষুদ্রতর বলে। যাহার পীড়কা অগ্নিদাহের মত অসহ্য হয়, এবং এত অধিক পীড়কা উঠে যে, রোগী সর্ব্ব-সময়ের জন্য সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় অসুস্থতা বোধ করে, তাহার নাম অন্তক। যাহার পীড়কা সকল গাঢ়, কঠিন ও পাকিলে কফের ন্যায় নির্গত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দাহ, বিমর্ষ ভাব ও চর্ম্মে বিবর্ণতা জন্মে, তাহার নাম বসন্ত। যে সকলপীড়কা মসুরের মত আকৃতি বিশিষ্ট এবং শীঘ্রই উহা পাকিয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম মসূরিকা।

শার্ঙ্গধর ক্ষুদ্ররোগ গণনা প্রসঙ্গে শুধু বলিয়াছেন--মসূরিকা রোগ চৌদ্দ প্রকার। মাধব কর তাঁহার নিদান সংগ্রহে এই চৌদ্দ প্রকার বসন্তের বিশদ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই সকলের লক্ষণ ও রোগের হেতু বা নিদান অন্য তন্ত্র হইতে কি নিজ পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ ফলের দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আজকাল যে সব বসন্ত রোগ দেখা যায়, মাধব-নিদানে তাহার অনুরূপ লক্ষণই সংগৃহীত হইয়াছে। মাধব করের কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি অন্যান্য প্রধান প্রধান শাস্ত্রে যাহা নাই অথচ অতি প্রয়োজনীয়, এমন বিষয় সমুদয়েরও নিদান লক্ষণাদি লিপিবদ্ধ করিয়া ভিষক্‌কুলের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

বসন্ত রোগের নিদান যথা:—

"কট্বম্ল লবণ ক্ষার বিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ।
দুষ্ট নিষ্পাব শাকাদ্যৈঃ প্রদুষ্ট পবনোদকৈঃ॥
ক্রূর গ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষাঃ সমুদ্ধতাঃ।
জনয়ন্তি শরীরেঽস্মিন্ দুষ্টরক্তেন সঙ্গতাঃ।
মসূরাকৃতি সংস্থানাঃ পীড়কাঃ স্যুর্মসূরিকাঃ।
তাসাং পূর্ব্বং জ্বরঃ কণ্ডুর্গাত্র ভঙ্গোঽরতির্ভ্রমঃ॥
ত্বচি শোথঃ স বৈবর্ণ্যো নেত্ররাগশ্চ জায়তে।"

কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার দ্রব্য ভোজন, সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য আহার, পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্ত্বে পুনর্ভোজন, দূষিত অন্ন, পানীয়, শিম ও শাকাদি আহার, বিষাক্ত বায়ু ও জল সেবন, দুষ্ট গ্রহগণের কুদৃষ্টি প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত ও দুষ্ট রক্তের সহিত মিলিত হইয়া মসূরের মত আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট যে সকল পীড়কা জন্মায় তাহার নাম মসূরিকা। জ্বর, কণ্ডু, গাত্রবেদনা, অনবস্থিত চিত্ততা, ভ্রম, চর্ম্মের স্ফীতি ও বিবর্ণতা এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা প্রভৃতি ইহার সাধারণতঃ পূর্ব্ব লক্ষণ। ইহার পর চৌদ্দ প্রকার মসূরিকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ বলা হইয়াছে।

নিদানে দেখা যায়, বাতাদি দোষ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। এখন প্রশ্ন এই —যাহার রক্ত দূষিত আছে তাহারই উক্ত কারণ সমুদয় ঘটিলে এ রোগ জন্মিবে, কিংবা এসব কারণে বিশুদ্ধ রক্তেও সমকালীন দোষ জন্মাইয়া রোগ উৎপন্ন করিবে? এই নিদানের টীকায় বিজয় রক্ষিতের শিষ্য ভিষকচূড়ামণি শ্রীকণ্ঠ দত্ত এ বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"দুষ্ট রক্তেন সঙ্গতা ইত্যনেন রক্তস্য কট্বম্লাদিভির্হেতুভির্বিশেষেণ কোপং দর্শয়তি, অতএবোক্তং তন্ত্রান্তরে—

পিত্তং শোণিত সংসৃষ্টং যদা দূষয়তি ত্বচং।
তদা করোতি পীড়কাঃ সর্ব্বগাত্রেষু দেহিনাং॥
মসূর মুদ্গ মাষাণাং তুল্যাঃ কোলোপমা ইতি।
মসূরিকাস্ততা জ্ঞেয়াঃ পিত্ত রক্তাধিকা বুধৈঃ॥" ইতি।

এই প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মসূরিকা রোগের যে সকল হেতু উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যেমন বাতাদি দোষকে কুপিত করে, তেমন রক্তকেও সঙ্গে সঙ্গে দূষিত করে। যেহেতু কটু অম্ল বিরুদ্ধভোজনাদি রক্তদুষ্টির অন্যতম কারণ; কাজেই রক্ত দুষ্ট হওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু মূলের পাঠ দ্বারা ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না। অনেক স্থলে দেখা যায়, বসন্তের কারণও আছে এবং রক্তদুষ্টি পূর্ব্ব হইতেই আছে, তাহাদের যেন বসন্ত রোগটি বেশী হয়। পাঁচড়া চুলকণাগ্রস্ত অনেকেরই বসন্ত প্রকোপের সময় বসন্ত হইয়া থাকে। আর একটি কথাও ভাবিবার বিষয় এই, বসন্ত রোগটি যখন সংক্রামক, তখন

নিদান বা রক্তদুষ্টির অপেক্ষা না করিয়া স্পর্শাদি ক্রমেই রোগটি অধিক স্থলে উৎপন্ন হয়। বসন্ত পীড়িতের সংসর্গে যাহারা আসে, তাহাদেরও সকলেরই যে বসন্ত হইবে এমনও কোন প্রমাণ নাই। ইহা পরীক্ষা করাও বিশেষ আবশ্যক যে, বসন্তগ্রস্তের সংস্রবে রহিয়াছে অথচ বসন্ত হয় নাই, কোন স্থলে বা হইয়াছে। সে সমুদয় লোকের আহার, বিহার ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হইবে রোগটি কি কারণে সুস্থ দেহে উৎপন্ন হয়। কেহ কেহ বসন্ত রোগের সংক্রামকতা আদৌ স্বীকার করেন না। সংক্রামকতা যাঁহারা স্বীকার করেন না তাঁহারা অবশ্যই আহার বিহারাদি কারণের গুরুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আর যাঁহারা সংক্রামকতাই রোগ সৃষ্টির প্রধান হেতু বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কটু অম্লাদি দ্রব্য সেবনের নিদানও গৌণ ভাবে গ্রহণ করিবেন। নিদানোক্ত কারণগুলি বিদ্যমান নাই, এমন লোকেরও যখন একমাত্র সংস্পর্শহেতু রোগ জন্মিয়া থাকে, তখন এই প্রত্যক্ষ প্রমাণও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে বসন্ত রোগের নিদান সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা নাই, তবে তাঁহারা এইমাত্র বলিয়াছেন যে, রোগটি বিষজনিত। বসন্ত বিষ শরীরে যে কোন প্রকারে প্রবিষ্ট হইলেই রোগ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু যাহাদের টিকা হইয়াছে, তাহাদের বসন্ত বিষ শরীরস্থ হইয়াও ক্রিয়া করে না, যদিও করে, তাহা তেমন অনিষ্ট জনক হয় না। মাধব-নিদানে এই ভাবের কথা না থাকিলেও আর কোন শাস্ত্রের যুক্তিতে এমন ভাবের অভাব নাই, তাহার আলোচনা স্বতন্ত্র ভাবে করা হইবে। বস্তুতঃ বিষই এ রোগের প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য ও এদেশীয় ডাক্তারগণ রোগের লক্ষণগুলি ও শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া রোগ পরিচয়ের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। সচরাচর আমরা যাহাকে বসন্ত বলিয়া থাকি, তাহা কি প্রকৃত বসন্ত অথবা বিসর্প, বিস্ফোট কি কুষ্ঠ, তাহার প্রায় বিচার হয় না। নিদান বিচার করিয়া অনেক সময়ই রোগ নির্ণয় চলে না, বরং উহাতে বিষম গোলে পড়িতে হয়। রোগসকল প্রায় মুখ্য কারণ অপেক্ষা গৌণ কারণ লইয়াই জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ কয়টি রোগ হেতুদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়? শাস্ত্রে যে সকল হেতু যে রোগ

সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, প্রত্যক্ষতঃ সে সমুদয় হেতুর উপলব্ধি কমই হইয়া থাকে। রোগিচিকিৎসার্থ লক্ষণ পরিচয়ই বিশেষ আবশুক, সেই লক্ষণ সমূহ আয়ুর্ব্বেদে বড়ই অস্পষ্ট, বহু শাস্ত্র অধীত না হইলে প্রকৃত রোগ নির্ণয় সহজ নহে। বসন্ত রোগকে ইহার প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও মসূরিকা বা বসন্ত রোগের নিদান ও লক্ষণ সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে বড়ই সমস্যা উপস্থিত হয়। আমরা প্রবন্ধের বিস্তৃতি ভয়ে অগু সে সমুদয় আলোচনা করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও বসন্ত রোগের মধ্যে পরস্পর কি ভেদ তাহার বিশদ আলোচনা আবশুক। বসন্ত রোগের চিকিৎসা সাধারণ রক্তদুষ্টির চিকিৎসা হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। সুশ্রুত স্পষ্টই বলিয়াছেন:—

"মসূরিকায়াং কুষ্ঠঘ্নলেপনাদি ক্রিয়াহিতা।
পিত্তশ্লেষ্ম বিসর্পোক্তা ক্রিয়া বা সংপ্রশস্যতে॥"

সুশ্রুত উহার কোন স্বতন্ত্র চিকিৎসার উল্লেখ করা আবশুক মনে করেন নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ কুষ্ঠ ও বিসর্প রোগোক্ত ঔষধাদির অনুরূপ ঔষধ যুক্তি দ্বারা নির্ব্বাচন করিয়া বসন্ত রোগাধিকারে প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি সে সমুদয় ঔষধই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রায় নূতন ঔষধ খুঁজিয়া লওয়া হয় না।

টিকা যে বসন্ত রোগের একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক, তাহা আয়ুর্ব্বেদের কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না। যে সময় হইতে এদেশে টিকার প্রচলন হইয়াছে, তাহার পরও আয়ুর্ব্বেদের কোন কোন নূতন চিকিৎসা গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছে। অথচ সকলেই একবারে নীরব রহিয়াছেন, তবে কি তাঁহারা টিকার উপযোগিতা অনুভব করিতে পারেন নাই? বসন্ত রোগটি যে সংক্রামক তাহাও কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। বসন্ত রোগ যে ভয়ঙ্কর সংক্রামক তাহা একরূপ অবিসংবাদিত সত্য। এহেন অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি উল্লেখ করিতেও তাঁহারা উদাসীন ছিলেন। আজকাল পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, টিকার উপযোগিতা অকিঞ্চিৎকর, আর রোগটি যে সংক্রামক তাহাও পরীক্ষিত সত্য নহে। তাঁহারা যাহাই মত প্রকাশ করুন, বসন্ত রোগে টিকা

দেওয়ার ন্যায্যতা ও সংক্রামকতার সত্যটি একবারে উল্টাইতে তাঁহাদের কিছু বেগ পাইতে হইবে। সত্য উদ্‌ঘাটিত হউক, লোক সকল নির্ব্ব্যাধি ও নিরুপদ্রব হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করুক, ইহা সকলেরই কামনা। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে সুধীবর্গের সকরুণ দৃষ্টিপাত হউক, ইহাই চির অভিলাষ।

পল্লী-চিকিৎসক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুরেন। রাতকাণার ঔষধ কি?

হরি। 'রাতকাণা'কেই আমরা 'হেতান' রোগ বলি।

একটী কবরী কলার মধ্যে একটী ছারপোকা ভরিয়া রবিবার দিন প্রাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া ঘরের ছাঁচির (ছঞ্চার) নীচে দাঁড়াইয়া যদি উহা খাইয়া ফেলে, একদিনে উক্ত রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। স্থলবিশেষে এই ঔষধ দুইবার সেবন করাইতে হয়। দুইবারের বেশী এই ঔষধ ব্যবহার করাইতে হয় নাই।

সুরেন। রবিবার ছাড়া কি অন্যদিনে চলে না? ঘরের ছাঁচির নীচে দাঁড়াইবার আবশ্যকতা কি? পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া ঔষধ খাইতে হইবে, ইহারই বা অর্থ কি?

হরি। আমরা আপনাদের বিজ্ঞানের ন্যায় প্রতি কথার কারণ-প্রমাণ দিতে অক্ষম; যেহেতু আমরা বিদ্যাহীন। অবশ্যই ইহার একটা গূঢ় রহস্য আছেই আছে, আমি উহা জানি না। 'শনিবার,' 'মঙ্গলবার,' 'দক্ষিণদিক,' 'পূর্ব্বমুখ,' প্রভৃতি অনেক 'ঠিক্‌ঠাক্' এই অবধৌতিক মতের চিকিৎসার মধ্যে দেখিতে পাইবেন। যাহা নিয়ম বলিয়া জানি, তাহাই বলিয়া যাইতেছি। গুরুবাক্যই আমরা মানিয়া চলিয়াছি এবং চলিতেছি। অন্যপথে চলি নাই চলিতে সাহসও করি নাই; কাজেই অন্যবারে হয় কি না, জানি না। ইহাতে আপনারা অন্ধবিশ্বাসই বলুন আর যা'ই বলুন, প্রমাণ করিবার

যখন ক্ষমতা নাই তখন আমাদের ঐ অন্ধবিশ্বাসই ভাল। ফল পাওয়া যায়, এইমাত্র জানি। কারণ খুঁজিয়া বাহির করা অনেক স্থলেই অসম্ভব; তজ্জন্য কারণানুসন্ধানের প্রবৃত্তি আমাদের হয় না। আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনাদের শিক্ষিত নামধারী পাশ করা ডাক্তারদের মধ্যেই বা শতকরা কয়জনে তাঁহাদের ব্যবহৃত ঔষধের 'ফল কেন হয়' তাহা জানেন? অধিকাংশই এই দ্রব্যের এই গুণ এইমাত্র দেখিয়া শিখিয়া রাখেন; কেন এই গুণ হয়, তাহার মীমাংসা করিতে কয়জন চেষ্টা করেন, আর চেষ্টা করিয়াই কয়জন প্রত্যেক কার্য্যের কারণ বাহির করিতে সমর্থ হ'ন। 'ঘরের ছাঁচি,' 'পূর্ব্বমুখ' প্রভৃতি সম্বন্ধেও আমার উত্তর ঐ একই রূপ।

এই ঔষধের নামই 'কলা পড়া।' রোগী কিম্বা অপরের অজ্ঞাতে কলার মধ্যে উহা ভরিয়া দিতে হয়।

পানের সহিত জোনাকী পোকা—চলিত কথায় যাহাকে 'জুনী' পোকা বলে—সন্ধ্যাবেলা সেবন করিলে অথবা পানের রস প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে চোকে ৩।৪ কোঁটা করিয়া দিলে উক্ত রোগ সারে।

ভাল গব্যঘৃত গরম করতঃ হাত পায়ের তেলোতে এবং ব্রহ্মতালুতে ও চক্ষুর পাতার উপর মালিস করিলে অচিরেই রোগমুক্ত হওয়া যায়।

দধির সহিত গোলমরিচ ঘষিয়া অল্প মাত্রায় চক্ষুতে দিলেও রাত্র্যন্ধতা (হেতান) রোগ দুরীকৃত হয়।

সুরেন। এই রোগে চাউল মাপিবার 'পুরা' (সের) দিয়াও নাজানি কি করে?

হরি। হাঁ, আন্ধার (কৃষ্ণ) পক্ষের রাত্রিতে ঘোর সন্ধ্যাবেলায় রোগীসহ চিকিৎসক বসে। সম্মুখে একটী 'পুরা' থাকে। কেহ কেহ শনিবার কি মঙ্গলবার সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করে, কেহ বা আমাবস্যা রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে তিনদিন ঐরূপ করে; কাহারও মতে রোগীকে বামদিকে ও 'পুরা'টী ডানদিকে রাখিয়া উত্তরমুখ কি পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিতে হয়! চিকিৎসক নিম্নোক্ত প্রস্তাবটী (উহাই একটী মন্ত্র) বলিতে থাকে আর ঐ রোগী উহা অতি মনোযোগের সহিত একাগ্রচিত্তে শুনিতে থাকে। প্রস্তাবটী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাটি গড়াইয়া দিয়া রোগীকে ধরিয়া

আনিতে বলে—এরূপে একই বেলা, তিন বার করায়। ইহাতেও অনেক রোগী আরোগ্য হয়।

প্রস্তাবটী এই—"এক গাঁয়ে তিনটী ছেলে ছিল। তার একটী ন্যাংটা, একটী কাপড় পরিতে জানে না, একটীর কাপড়ই নাই; তারা তিনজনে একত্রে দেশ দেখিতে বাহির হইল। যাইতে যাইতে যায়, আর রাস্তা ফুরায় না? ফুরায়না, পথের মধ্যে এক জা'গায় পাইল তিনটা পয়সা। পয়সা, তার একটা টুটা, একটা কাঁটা, একটার তামাই নাই—যে'টার তামা নাই, মাত্র সেইটাই টোকাইয়া লইল—লইল ত লইল, থুইল কোথা? যার কাপড় নাই তা'র কোছে। যায়, যাইতে যাইতে পথে এক জেলের সঙ্গে দেখা—দেখা হ'ল, আর ঐ তামা ছাড়া পয়সাটা দিয়া কিনিল তিনটা টেংরা মাছ; কিনিল, লইয়া চলিল ৩ জনে ৩ টা;—যায়, ঘর নাই, দুয়ার নাই, কেবল মাঠ। দুপুর বেলা পাইল একটা কুমার বাড়ী—বাড়ীতো বাড়ী যেন রাজপুরী—রাজপুরীতে মোটে তিনখানা ঘর—একটা প'ড়ে গেছে, একটার চালা নাই, আর একটার থাম নাই, খুঁটা নাই—নাইত নাই, ভিটীর মাটীর চিহ্নও নাই; সেই ঘরে ঢুকিল ছেলে তিনটা—ঢুকিল, পাইল তিনটা পাতিল—তা'র ১টা ভাঙ্গা, ১টা চুরা, একটার তলাই নাই, যেটার তলা নাই, সেইটায় বসাইল মাছ পাক। তিনজনে কাঠ কুড়াইয়া আগুণ ধরাইল;—ধরাইল, পাক হইল, মাছ কয়টা পড়ে গেছে, ঝোলটুকু বাকী আছে; আছে, ঝোল-টুকুই তিনজনে উদর ভরিয়া খাইল—খাইল, আবার চলিল।"

এই শেষ "চলিল" কথার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসক "পুরাটী"ও গড়াইয়া চালাইয়া দেয়।

সুরেন। এযে, একটা আজ্‌গুবি মন্ত্র! আচ্ছা, রোগীকে কি পুরাটা নিয়াই আসিতে হয়?

হরি। আজ্‌গুবি মন্ত্রই বলুন, আর গুলিখোরী গল্পই বলুন; লোকে এর সাহায্যে উপকার পেলেই ত হ'ল? রোগীকে অনুসন্ধান করিয়া পুরাটা নিয়াই আসিতে হয়।

সুরেন। আচ্ছা, রোগীতো রাতকাণা, যদি সে পুরাটা দেখিতে না পায় এবং আনিতে না পারে, তবে কি হয়?

হরি। অন্য একজনে রোগীকে পুরাটা অগত্যা তখন দেখাইয়া দেয় এবং রোগী নিয়া আসে।

সুরেন। এখন তিমির রোগের ২।১ টা ঔষধ বল না?

হরি। "তিমির" রোগ কি বুঝিলাম না।

সুরেন। দর্শন দোষ অর্থাৎ কুয়াসার ন্যায় বা ঘোর ঘোর দেখা।

হরি। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে 'ধুয়া ধুয়া দেখা বা আব্‌জা আব্‌জা দেখা' বলি, তাই কি?

সুরেন। হাঁ, চোকে কম দেখা;—কেহ কেহ যাহাকে 'চল্লিশে পড়িয়াছে' বলে।

হরি। আহারান্তে জল দ্বারা করতল ঘর্ষণ করিয়া ধুইয়া, হস্তস্থিত জলের ফোটা চোকে দিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

সেঁচি শাকের পাতার রস সপ্তাহ কাল বা কিছু অধিকদিন হাতের ও পায়ের তেলোতে মালিস করিলে উক্ত রোগ দূর হয়। মস্তিষ্ক রোগ হেতু চক্ষুর দৃষ্টিহীনতা ঘটিলেও উহাতেই আরোগ্য হয়।

চিত্রা নক্ষত্র ও ষষ্ঠী তিথি একত্র হইলে সেই দিন পরিষ্কৃত সৈন্ধব লবণ চূর্ণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে অসাধ্য তিমির রোগও আরোগ্য হয়।

শ্বেত পুনর্নবার রস ও জল সমপরিমাণে মিশাইয়া চোকে দিলে চোকের ঝাপ্‌সা কাটিয়া যায়।

সুরেন। চক্ষু দিয়া জল পড়িলে বা জ্বালা হইলে তাহা নিবারণের উপায় কি?

হরি। প্রাতঃকালে ঠাণ্ডা জল দ্বারা মুখ পূর্ণ করতঃ গণ্ডুষ দ্বারা চক্ষুর মধ্যে গাঢ়রূপে শীতল জল সিঞ্চন (জল ঝাপ্টা) করিলে চক্ষু রোগ সমূলে নষ্ট হয়।

শ্বেত পুনর্নবার রস ও তৈল সমভাগে মিশাইয়া চোকে দিলে চক্ষু দিয়া জল পড়া ও জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

জলে ডুব দিয়া চোক মেলিয়া চোকের সম্মুখে হস্ত দ্বারা জল আলোড়ন করিলেও জ্বালা ও জল পড়া নিবারিত হয়।

মধুসহ সামান্য পরিমাণ লবঙ্গ ঘসিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া চোকে দিলে চক্ষুর নালী, ফুলা, জল পড়া প্রভৃতি ভাল হয়।

সুরেন। চক্ষুতে হঠাৎ কিছু ঢুকিলে বড়ই কষ্ট হয়, ঐ জ্বালা দুরীকরণের উপায় আছে কি?

হরি। আছে; সাধারণতঃ চোক হইতে প্রবিষ্ট দ্রব্যটী খুলিয়া ফেলিতে পারিলেই অচিরে জ্বালা দূর হয়।

যদি চক্ষুতে কি ঢুকিয়াছে বুঝা না যায় এবং কোনও উপায়েই উহা বাহির করিতে না পারা যায়, তবে চোকের ভিতর একটী পরিষ্কৃত চাউল প্রবেশ করাইয়া দিবেন; ভয় নাই, ঐ চাউল দ্বারা কোনও যন্ত্রণাই হইবে না, বরং ঠাণ্ডা বোধ হইবে। পরে চোক বুজিয়া থাকিলে বা ঘুমাইলে কিছুক্ষণ পরেই প্রবিষ্ট দ্রব্যটি সঙ্গে করিয়া চাউলটী আপনাআপনিই বাহির হইয়া পড়িবে; চোকের জ্বালা যন্ত্রণা ফুরাইয়া যাইবে।

চোকে কিছু প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র যদি তখন তখন চক্ষু মেলিয়া পেছনে ৩।৪ পদ হাটা যায়, তবে দেখিবেন আপনার চোকের পোকা বা ধুলা বালি আপনা আপনিই বাহির হইয়া গিয়াছে; কোনও জ্বালা যন্ত্রণা নাই। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ দক্ষিণে, বামে ও ঊর্দ্ধমুখে থুথু ফেলিয়া ও পেছনে হাটিয়া আসে এবং পোকা বা ধুলা প্রভৃতি চক্ষে পড়ার দরুণ জ্বালা হইতে রক্ষা পায়।

সুরেন। চোকের কোটায় বা পাতায় পিছির নিকট দিয়া যে ব্রণ হয় উহার ২।১টী ঔষধ বল না!

হরি। যাহাকে আমরা 'নুঙ্গা বা লুঙ্গা' বলি তাহার কথা কি?

সুরেন। হাঁ; উহা হইলে রোগস্থান বড় চুলকায় ও জ্বালা দেয়।

হরি। উক্ত ব্রণে ছেলেপিলের লিঙ্গ স্পর্শ করাইলে উহা সারে। 'দা' বা লৌহ নির্ম্মিত কোনও দ্রব্য স্পর্শ করাইলেও আরোগ্য হয়।

গরম জলে স্বেদ দিলেও উপশম হয়।

একটী ছিনে জোঁক (ক্ষুদ্র আয়তনের স্থলজ জোঁক) আনিয়া উহা ঐ ব্রণে বুলাইলে (ছোঁয়াইয়া নাড়াচাড়া করিলে) ঐ রোগ ভাল হয়—জোঁকটী কিন্তু তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।

আজ অনেক হইল, এখন আর নয়; আবার কা'ল হইবে, এখন বিদায় হই।

সুরেন। আচ্ছা, ভু'লোনা যেন।

হরি। যখন কথা দিয়াছি, তখন এটা আমার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের মাঝে হইয়া পড়িয়াছে, ভুলিব কেন? (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

আয়ুর্ব্বেদ-সভা।

(কলিকাতা)

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী।

গত ৯ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭ঘটিকার সময় আয়ুর্ব্বেদ-সভার সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন ৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট পাথুরিয়া-ঘাটায় বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কুলদাকিঙ্কর রায় (স্থায়ী সভাপতি), কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত করুণাকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাশ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ সেন গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন (ঢাকা), কবিরাজ শ্রীযুক্ত শৈলজামোহন সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় চৌধুরী (নবাবগঞ্জ, মালদহ), কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রায়, বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন, বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত কালিদাস গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশ গুপ্ত (সেনদীয়া ফরিদপুর), কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন,

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত (ভবানীপুর), কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমেশচরণ রায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন. কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহানন্দ কবিরাজের পুত্র, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালিকেশ সেন গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় চৌধুরী (মূলঘর খুলনা), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন (খুলনা), শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার (ফরিদপুর), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন (ভবানীপুর), কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামদাস গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ধরণীধর গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায় (খান্দার পাড়া ফরিদপুর), কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন, (সহ-সম্পাদক) কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক)।

ঠিক ৭ঘটিকার সময়ই কার্য্য আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান বর্ষের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত কুলদাকিঙ্কর রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভ্যগণ সকলেই এবার যথাসময়ে আগমন করিয়া সভার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন; ইহা সভার বিশেষ আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, বহরমপুর, নাটোর, প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকেই উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ ও সভার সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ঐরূপ পত্র কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সমস্ত পত্রপ্রেরক-গণের নাম সম্পাদক সভার সমক্ষে প্রকাশ করেন। আর একটি আনন্দের বিষয় যে, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ঢাকা হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হইয়া এই সভায় যোগদান করিয়া অনুগৃহীত করেন। কবিরাজ ভিন্ন অন্য যে সমস্ত মহোদয় সভায় যোগদান

পূর্ব্বক সভার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটও সভা একান্ত অনুগৃহীত ও কৃতজ্ঞ।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সম্পাদক বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। গত বৎসরে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কোনও কার্য্য হয় নাই, বিবরণীতে আয়ুর্ব্বেদ-মহামণ্ডল ও নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্যসম্মেলনের উল্লেখ করা হয়। আগামী ষষ্ঠ বৈদ্যসম্মেলনকে কলিকাতায় আহ্বান করা হইয়াছে তাহা বিজ্ঞাপিত হয় এবং ইহা উপস্থিত সকলেই অনুমোদন করেন। বার্ষিক বিবরণী পঠিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবার পর আগামিবর্ষের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থায়ী সভাপতি ও অন্যান্য কার্য্যকারকগণ মনোনীত হন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুলদাকিঙ্কর রায়।

প্রস্তাবক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন।

সহকারী সভাপতি—বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন। বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাভূষণ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন।

প্রস্তাবক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গুপ্ত।

সমর্থক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন।

আচার্য্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।

প্রস্তাবক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন।

সমর্থক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

ধনাধ্যক্ষ—বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন।

প্রস্তাবক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গুপ্ত।

সমর্থক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন।

সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন এবং সহকারী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত শৈলজামোহন সেন।

প্রস্তাবক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

সমর্থক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিভূষণ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহানন্দ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুপ্ত চৌধুরী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় কবিচিন্তামণি, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রদাস গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজমোহন সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল মজুমদার, কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বারাণসীনাথ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সেন কাব্যতীর্থ (সম্পাদক "আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ" ঢাকা) কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন (ঢাকা) কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন (কাশীপুর) কবিরাজ শ্রীযুক্ত ত্র্যম্বকেশ্বর রায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্ত।

প্রস্তাবক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্ত।

সমর্থক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ধরণীধর গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন সেন, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত।

প্রস্তাবক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী রঞ্জন সেন।

সমর্থক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়ের প্রেরিত প্রবন্ধ "প্রাচ্য-বিজ্ঞাপন" অতি দীর্ঘ বলিয়া পঠিত স্বরূপে গৃহীত হয় ও প্রবন্ধ লেখককে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "ম্যালেরিয়া" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আহুত হইলে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত

নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাহা পাঠ করেন। তৎপরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাশ গুপ্ত মহাশয় ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আয়ু-র্ব্বিজ্ঞানানুসারে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃদ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন, তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

গত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে বৈদ্যসম্মেলনের অধিবেশন সম্বন্ধে যে অনুমোদন প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা এই সভাও অনুমোদন করিলেন।

প্রস্তাবক সভাপতি—

বৈদ্যসম্মেলন সম্বন্ধে কলিকাতার এবং অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদীয় সভার সম্পাদকগণের নিকট পুনরায় জানান হউক এবং আবশ্যক হইলে সম্পাদক স্বয়ং গিয়া তাঁহাদের মত জানিবার চেষ্টা করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন।

সমর্থক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

ইহার পরে সভার সহকারী সম্পাদক—কবিরাজ, শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং বৈদ্য সম্মেলন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন। পরে সভাপতি মহাশয় ও গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়। *

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন
সম্পাদক, আয়ুর্ব্বেদ সভা।

---

* আমরা আয়ুর্ব্বেদ সভার কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া অবিকল তাহা উদ্ধৃত করিলাম, স্থানাভাব বশতঃ এবারে এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই সভার উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান পত্রাদিও আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যথাবসর আমরা এ সকল বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আঃ বিঃ সঃ—।